আতসঘর

আনিকা মারজান ইরা

"ক্যাঙলার মা, ও ক্যাঙলার মা! আরে কানে কি পট্টি দিয়েছিস নাকি, অ্যাঁ।" "কি হয়েছেটা কি? সক্কাল বেলা উঠে এমন চিলের মত চ্যাঁ চ্যাঁ করলেই তোর ৭ভাল লাগে, না?" "এ্যাহ, ওরে আমার মহারানি, এমন ভান করেছ যেন আমিই চিল্লুর পাড়ি। আর তিনি যেন কত সাধু, মুখ থেকে যেন মুক্তা ঝরে! কথা বাড়াস না, চাকায় তেল দে। চান করে ধারানিটা নিয়েই বেড়োবো। দেশের অবস্থা ভাল না। কে জানে এবার বুঝি নিজের হাঁড়ির চাকায় ঘুঘু চড়ে।" কথা ভুল না। আজ অনেক দিন ধরেই গ্রামে নানা কিছু হয়ে গেছে। গ্রামে সেনা এসেছে, এই লম্বা লম্বা হাত, হাতে কি যেন কালা একটা ডান্ডার মতো জিনিস নিয়ে ঘুরে। এরা নাকি দৈত্যর মত দেখতে। ক্ষার কাচতে গিয়ে ময়না দিদি বললো। ওদের গ্রামে আগুন দিয়েছে, শুধু ওদের গ্রামই না আরও অনেক গ্রাম পুড়িয়েছে, বাজার পুড়িয়েছে। পুড়ে ছাই করেছে। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে। জোয়ান পোলাপাইন কিছু রাতে অন্ধকারে কই জানি গেছে। তারা নাকি ওই দৈত্যদের শাস্তি দেবার ট্রেনিংয়ে গেছে। তবে এই কথা কেউ সামনাসামনি জোর গলায় বলে না, চোখের ইশারায় কথা কয়। গ্রামের মানুষ বাক্স পোটলা নিয়ে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটেছে। এই শুনে ওদের গ্রামও আজ কয়েকদিনে খালি হয়ে গেছে। পথে ঘাটে খুব কম মানুষই দেখা যায়। ভেবেছিল ক্যাঙলার বাপকে বলে দেখবে কোথাও যাওয়ার বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। একে একে সবাই চলে গেছে। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে। তাদের তিন কূলে তো নেই কেউ। ক্যাঙলার মা কথা না বাড়িয়ে ধারানির চাকায় তেল দিয়ে সেটা সচল করার কাজে নেমে গেলো। হরিপদ, মানে ক্যাঙলার বাপ চান সেরে বেড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ক্যাংলার মা ক্যাংলাকে নিয়ে শুরু করল গৃহস্থালির কাজ। কিন্তু সেই কাজেও যেন আগেরমত সেই আনন্দ নেই। একটা বিষন্ন, বিমূর্ত ভাব। খেতে হবে তাই খাচ্ছে, পরতে হবে তাই পরছে।

"ওই পাটা, পুতা, বটি ধার। এই বটি, দাঁও ধার।" রাস্তায় বেড়িয়ে হরিপদ এর প্রথম কাজ হাঁক পাড়া। এইখানে দশ গ্রামের কার কাছে ধার করার যন্ত্র নাই। ধার দেনা করে একসময় ঢাকায় গিয়ে দেখে রাস্তায় এর ব্যবসা ভালই। যন্ত্রটা চালানো শিখে হরিপদ। তারপর একদিন বাকি থাকা আর কিছু টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনে নিয়ে গ্রামেই একটা ব্যবসা শুরু করে। যা পায় তাতেই সংসার চলে যায়। গ্রামের সকলের কাছে সে 'হরি ধারানি' নামেই পরিচিত। গ্রামের মানুষ যে যখন পারে একটু ধার করিয়ে নেয়। কোরবানির সময় ভাল দামই পায়। আর যে সময় কাম পায় না সেই সময় কামারগিরি করে। কিন্তু এখন কামারপাড়াও জ্বলে ছাই। তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দা, বটি ধারের কাজে নেমেছে সে। "কিরে হরি, যাচ্ছিস কোথায়? গ্রামে তো কেউ নেই।" আরিফ মাস্টারের গলায় থামলো হরি। "এই তো বেড়ুলাম স্যার। পেটে তো দানা পানি পড়তে হবে।" "তাও ঠিক। " আরিফ মাস্টার এই গ্রাম এর সম্মানিত মানুষ। ছেলে মেয়েদের পড়ায়। ক্যাংলাও পড়ে স্যার এর কাছে। দেশের মায়ায় এই গ্রাম আর ছাড়েন নাই। এই গ্রামের মাটি কামড়েই পড়ে আছেন তিনি। "তা তোম্রা ছেলে আছে কেমন?" "আছে স্যার।" "রাস্তায় দেখে শুনে চইলো। পাক সেনার চ্যালা নামছে, খুব বেশি সুবিধার নয় ওরা।" "তাই নাকি স্যার?" "হ্যাঁ, এরা নিজেদের নাম দিয়েছে 'রাজাকার'। আর রনু ডাকাত যখন সভাপতি হয়েছে তখন বুঝতেই পারছ অবস্থা কেমন হতে পারে।" রনু ডাকাত খুনের আসামি। ডাকাতি করতে গিয়ে কাকে যেন খুন করেছে। কেউ এখনো ধরতে পারে নি ওকে। বেশ দাপট তার গ্রামে।" আচ্ছা স্যার, আমি তাহলে এখন যাই।" "ঠিক আছে, এসো।" যেতে যেতে হরিপদ ভাবতে লাগলো যদি রনু ডাকাত সভাপতি হয় তাহলে এই গ্রামের কোনাকামচি যা বাকি ছিল তাও আর বাদ থাকবে না। রনু ডাকাতের কথা ভাবতে ভাবতে যখন গ্রামের মূল রাস্তায় এসে হাজির হলো, তখনি রনু ডাকাত তার সামনে হাজির। তবে ঠিক তার সামনে নয়, রনু ডাকাত মিষ্টি বুড়ির বাড়ির সামনে পায়চারি করছিল। তাকে দেখে বললো, "কিরে হরি ধারানি,এইহানে কি করস?" "এই তো কামে যাই।" "তা বটি ধারের জইন্য মানুষ বুঝি আছে এই গ্রামে।" খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে, খুব রসিকতার সাথেই বললো রনু ডাকাত। যেন গ্রামে মানুষ না থাকাটা খুব মজার ব্যাপার। "পেটে দানা পানি নাই,এই কাম ছাড়া আর কোনো কাম তো আমার জানা নাই।" "একদিন যাইস স্কুলের মাঠে। স্যারদের কইয়া একখান কাম তোরে জুটায় দিমু। স্যারেরা আমায় খুব পছন্দ করে।" গদ্গদ হয়ে বলল রনু ডাকাত। হরিপদ কিছু বললো না। কারন ওই পাকদের কাছে হাত পাতার ইচ্ছা তার একটুও নেই। যাদের জন্য তাদের গ্রামের এই অবস্থা তাদের কাছে হাত পাতা দুমুখো সাপ হওয়ার চেয়েও অধম। রনু ডাকাত আরও অনেক কিছু বললও কিন্তু হরি ধারানির কানে তার কিছুই গেল না। সবশেষে রনু ডাকাত মিষ্টি বুড়ির বাড়ির সামনে আরেকটু উঁকি মেরে সটকালো। হরিপদ তার যাত্রা শুরু করবে এমন সময় মিষ্টি বুড়ি ঘর থেকে বের হয়ে বললো, "এই ধারানি, এদিকে

আয়।" হরিপদ বুড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখল মিষ্টি বুড়ির হাতে একটা দাঁ চকচক করছে। দেখেই বুঝা যায় দাঁ এর ধার এখনও যায়নি। বুড়ি বললো, "এই দাঁও টায় ধার দে।" হরিপদ অবাক হলো। দাঁয়ে আর কি ধার দিবে সে বুঝতে পারলো না। "মিষ্টি বুড়ি তোমার দাঁ তো ধারই আছে। এ আর কি ধার করবো। "আবার ধার দে, এ ধারে কিচ্ছু হবে না।" "কি করবা দাঁও ধার দিয়া।" "হাত কাটমু।" "হাত কাটবা ,কি কও? কার হাত কাটবা?" "কথা না বাড়াইয়া ধার দে।" হরিপদ ভয়ে আর কিছু বলল না। অগত্যা হরি যন্ত্র ঠিক করে তাতে ধার দেওয়া শুরু করল। ধার দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার মাইয়াটা কই আছে, জানো কিছু?" বুড়ি কিছু বলল না, শুধু ধার যন্ত্রের চাকাটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। যখন পাকরা ঘরবাড়ি, বাজার সব পুড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন নাকি বুড়ির মেয়ে বাজারে গিয়েছিল লাউ বেঁচতে। বাজার থেকে তাকে আর পাওয়া যায় নি। অনেকে বলে পুড়ে গেছে। কেউ বলে পাকসেনা তুলে নিয়ে তাকে ছিলে খেয়েছে। সেই থেকে মিষ্টি বুড়ির মুখখানা আর ফুলের মতো মিষ্টি নেই। রুক্ষ শুষ্ক হয়ে গেছে। দেখলে ভয় লাগে। হরি ধারানি আবার বলল, "মিষ্টি বুড়ি তোমার বাড়ির সামনে রনু ডাকাতকে দেখলাম। লোকটা বেশি সুবিধার না, সাবধানে থাইকো।" এবারো মিষ্টি বুড়ি কিছু বলল না। দাঁ টা ধার দেয়া শেষ হলে সে নিস্প্রভভাবে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো। তারপর শুনশান নিরবতা। হঠাৎ করেই হরি ধারানির বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। এই মৃত্যুর মতো নিরবতায় থাকতে তার আর মোটেও ভালো লাগলো না। হুড়মুড় করে বেড়িয়ে আসলো ঘর থেকে।

রোদ পড়ে গেলে ধারানি বাড়ির পথ ধরলো। আজ একটুও কামাই হয়নি। ফেরবার পথে শুনতে পেলো কিছু আন্ডাবাচ্চা ছড়া কাটছে, "ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়, যাইতে যাইতে খ্যাঁচ খ্যাঁচায়। "তার পরক্ষণেই দেখতে পেলো রনু ডাকাত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে। তার লুঙ্গির গিট্টি প্রায় খুলে এসেছে। তার কবজি কাটা ডান হাত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। বাচ্চাগুলো তা দেখে চুপ করে গেলো। কিন্তু শত শত কাক শকুনের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল তারা বুঝি হাসতে হাসতে গড়িয়ে যাচ্ছে। সেই হাসি স্বাভাবিক নয়। এ যেন মা কালীর ভূখন্ডে চির ধরা অট্টহাসি। হরি ধারানি অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। নজরে পড়লো মিষ্টি বুড়ির বাড়িটা। সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর এক মুহুর্তও দাঁড়ালো না সে। বাড়ি ফিরেই দাওয়ায় বসে পড়ল হরি। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হলো না। পরদিন ক্যাঙ্গলার মা ময়না দিদির কাছ থেকে শুনে এল মিষ্টি বুড়ি নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে। বাড়িটা নাকি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। কিন্তু আগুন লাগার কারণ জানা নেই। বাড়ির সামনে খালি একটা দাঁ পড়েছিল, রক্তমাখা, কিছু দূরে ছিলো একটা কবজি কাটা হাত। আঙ্‌গুলের সোনার আংটি দেখে আর বুঝতে বাকি রইল না এ কার হাত। সবাই বলাবলি করছে, মিষ্টি বুড়ি তার কাজ শেষ করেই বিদায় নিয়েছে।

শিক্ষার্থী, ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজ

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

যুদ্ধ বালক বাঘা

প্রণব মজুমদার

- গুছিয়া লও! ঢাকায় পাক আরমি নাকি ঢুইক্কা পরছে! বিকালের মদ্যই তমরা কাশিমপুর চইল্লা যাও। এদিকটা আমি দেকতাছি। পরিস্থিতি ঠান্ডা অইলে রবিরে লইয়া আইয়া পরবা!

বাঘার বাবা শহরের নামকরা শিক্ষিত চিকিৎসক। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি অনেক উদ্বিগ্ন! সকালে ডিসেপেন্সারীতে যাবার সময় মাকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন! মা চুপসে যান! মার্চ মাসের শেষ প্রায়। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ হয়নি। বড় ছেলে বাবুল ও মেজ ছেলে স্বপন বাসায় নেই ক'দিন ধরে। এ অবস্থায় গ্রামের বাড়ী কিভাবে যাবে তা নিয়েও দুশ্চিন্তা ! প্রস্তুত নন এমন ভাবনা নিয়ে মা উত্তর দেন।

- তুমি জানলা ক্যামনে ঢাকার অবচতা খারাপ ?

- রেডুতে কইছে! পচিশা মারচের রাতরে পাকিসতানি আরমিরা ঢাকায় অনেক মানুষ মাইরা ফ্যালাইছে! শেক সাবেরে এরেস্ট করছে। এরেস্টের আগে হেইদিন বেসি রাতরে উনি যুদ্দের এনাউন্সমেন্ট করচেন। অবচতা বালো না!

বাঘাও ভাবনায় পড়ে গেলো! প্রথম সাময়িক পরীক্ষার দু'টি বিষয় সম্পন্ন হয়েছে মাত্র! গণি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী শিক্ষক রঞ্জিত স্যার অংক করান। মেধাদীপ্ত দুষ্টু ও সাহসী বলে তিনি ওকে নাম দিয়েছেন বাঘা! অংক পরীক্ষার দিন স্যার বলেছেন, 'দেখিস বাঘা চতুর্থ শ্রেণীতেও তোর প্রথম অইতে অইবো।' বার্ষিক পরীক্ষায় অংকেতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো একশোতে একশো পাওন লাকবো!' এ সময় গ্রামের বাড়ী গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে এমনটাই ভাবছিল তৃতীয় শ্রেণীর ফার্স্ট বয় বাঘা!

দুপুরে মামাতো ভাই সুবলকে নিয়ে চাঁদপুর কোর্ট স্টেশনে গেলেন বাবা। লাকসাম লোকাল ৬ ডাউনে বলাখালের সাতখানা টিকিট কেটে অপেক্ষা করছেন তিনি। বড় মনু, ছোট মনু, আবু, ভুতু ও বাঘাকে নিয়ে মা পৌঁছে গেছেন স্টেশনে। বাবার রোগী ও পরিচিত টিটিই মোজাম্মেল কাকা। বাঘাদের সাতজন যাত্রীকে রেলগাড়িতে বসিয়ে দিলেন তিনি।

দূর গ্রামের জিনিস ও গাছগুলো ঘুরছিলো অবিরত! ঝিকির ঝিকির গতিময় শব্দে চলা কয়লার রেলগাড়ি থেকে তা দেখছিলো বাঘাও! গাড়ীর জানালা থেকে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে খুব আনন্দ পাচ্ছিলো আবু ও ভুতুও। সাহাতলী স্টেশনে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রেন ক্রসিংয়ের জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষায় ছিলো ওদের গাড়ী। দুই স্টেশন পার হয়েই বলাখাল। দেড় ঘন্টা সময় যেন মুহূর্তেই ফুরিয়ে গেলো! মামাতো ভাইকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বলাখাল স্টেশন থেকে কাশিমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো ওরা! ছয় মাইল দূরত্বের পায়ে হাঁটা পথ কাশিমপুর! মাঝখানে রামপুর বাজারে যাত্রাবিরতি। সবাই রোদে হেঁটে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত! একটা খুপড়ি ঘরের সামনে বেঞ্চিতে বসলো ওরা সবাই। উরপুর গ্রামে বাড়ী বলে নিকটস্থ বাজারটা সুবলের বেশ চেনা। যাত্রাপথের জন্য সুবলকে বাবা টাকা দিয়েছেন। সে টাকা দিয়ে একটি খাবার দোকান থেকে জিলিপি নিয়ে এলো সুবল! বাঘা, আবু ও ভুতু তা পেয়ে বেজায় খুশি! কিন্তু মনুরা তা খাবে না! তাদের আবদার আনতে হবে গুড়ের মুরালি! কথা অনুযায়ী তা আনা হলো। মায়ের প্রিয় ঘন দুধ চা ও একটি বাবুল বিস্কুট আনলেন সুবল। সবার খাবার চাহিদা পুরণ হলো! তা খেয়ে সবার শরীরে যেন শক্তি এলো! ফের হাঁটা! ক্ষেতের আইল দিয়ে হেঁটে উরপুর, খোদাইবিল, রাজারগাঁও হয়ে কাশিমপুর বাজারে যখন ওরা পৌঁছলো তখন গোধূলি বেলা।

বাঘাদের গ্রামের বসত বাড়ীটা তিন বিঘা জায়গার মধ্যে! বাড়ীর প্রবেশ মুখে সারি সারি নারকেল, সুপারি, তাল, তেঁতুল ও চালতা গাছ। ডানপাশে দীঘি এবং বাঁ পাশে পুকুর। বিশাল বৈঠকখানার আগে দুটো গরচ ঘর। সামনে খড়ের মাচা ও গরুর তরল খাদ্যের জন্য মাটির তৈরি নাইনদা। মানে গামলা। চারপাশে বাঁশ দিয়ে মাঝখানে তা বসানো! থাকার জন্য পাঁচটি ঢেউ টিনের মাটির ঘর। কয়েকটাতে ধান চালের গোলাও রয়েছে। আছে বসত বাড়ীর পাশে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুসহ ৩৩ ধরনের ফলের বড় বাগান। ১১৩ কানি পরিমাণ আবাদি ফসলের ক্ষেত। বাঘারও গ্রামের বাড়ীটা পছন্দ। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রতি বছর রবি কাকু এ বাড়ীতে নিয়ে আসেন বাঘাদের।

মাটির উঠোনে ঢোকার আগেই মজুমদার বাড়ীতে হৈ হৈ রব পড়ে গেলো! ছুটে এলেন বাঘার বড় কাকী ও ছোট কাকী এবং তাদের ছেলেমেয়েরা। মজুমদার বংশে বউদের মধ্যে বাঘার মা সবার চেয়ে বড়। বাড়ী ও গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই ওনাকে ডাকেন বড় ঠাইন। সমীহ করে। অনেকদিন পর সবাই ওনাকে পেয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। বাঘা ও ভাইবোনরা নিচু হয়ে মাথা ছুঁয়ে কাকা কাকীদের প্রণাম জানালো। মা কাপড়ে মোড়ানো খুতি থেকে বাবার বাসার যক্ষের ধন রেডিওটা বের করে আনেন প্রথমে! তারপর ব্যান্ডিজ ও ডেটল। ছোট কাকীকে ডাকলেন কাছে।

- ধরো মুকুল রেডুটা যতনো কইরা রাইখো। তা দেখে সবার চক্ষুতো চড়ক গাছ! এ জিনিস বাড়ীর কেউ গ্রামে দেখেন নাই!

- আইচ্চা বরদি দ্যান!
দুষ্ট বাঘার অনুসন্ধানী চোখ! চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো সে। ঢুকেই বাড়ীর ভেতর পাকা ঘাটের সিঁড়িতে নামে। খুড়াতো ভাই সমীরকে নিয়ে হাত পা পরিষ্কার করে বাঘা! সমীর বাগানের একটি গাছে কোকিলের বাসা রয়েছে সে খবর ওকে জানায়। বাঘা জিজ্ঞেস করে বাড়ীর কয়টা হাঁস ও মুরগী এখন ডিম পাড়ে? বাগানে কি কি ফল পেকেছে! মোম আম গাছে মৌচাকটা কত বড় হলো ইত্যাদি ইত্যাদি।
বাঘারা এসেছে খবর পেয়ে পরদিন সকালে বোয়াল বাড়ী, নাপিত বাড়ী, দেওয়ানজী বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী, ধোপা বাড়ী ও বকাউল বাড়ীর পড়শীরা একে একে চলে এলো ওদের দেখতে। সমীরের বন্ধু সুধীর, নজরুল সুদীপ ও মামুন বাঘার সঙ্গে খেলতে আসে। গন্তব্য ফলের বাগান। আসার সময় স্টেশনে বাবা বলে দিয়েছেন বড়দের কথা শুনবে। পড়াশুনা করবে। পুকুরে যাবে না। গুরুজনদের মান্য করবে। দুষ্টুমি করবে না। গাছে ওঠবে না প্রভৃতি উপদেশ। সব প্রতিপালন করলেও দুষ্টুমি বাদ নেই ওর। গাছে আরোহণ নেই থেমে। অব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি কলস ভেঙ্গে দীঘিতে চারা নিক্ষেপের মাধ্যমে জলের ওপর এক্কা দোক্কা খেলা চলছে! রবি কাকু গোয়াল ঘর থেকে তা দেখছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি ও নির্ভয় প্রকৃতির বাঘা। সেজন্য ভালোবাসেন খুব কাকুও। ওর কাছে নানান প্রশ্ন কাকুর। দেশের পরিস্থিতি খারাপ কাকুও বুঝেন।
- চানপুরের অবস্থা বালা না বলে? তগো আইতে কষ্ট অয়নিতো বাবা?
- না কাকু! বেশ আরামেই আচিলাম। তবে হাটতে এট্টু কষ্ট অইচে আর কি !
ক'দিন পর বিকেল বেলা নিকট প্রতিবেশী ছোট বোয়াল বাড়ীর শুভাকাঙ্ক্ষী অলিউল্লাহ বকাউল এলেন। বৈঠকখানার সামনে উঠোনে জলচৌকিতে বসলেন তিনি। অলি কাকুকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হলো। বাঘা একটি অ্যানেমেলের থালায় করে চা ও সন্দেশ নিয়ে যায় অলি কাকুর কাছে। আরেক হাতে পিতলের গ্লাস। চা পান শেষে মাকে কাকু জানালেন শহর চাঁদপুর থেকে কিছুক্ষণ আগে তিনি এসেছেন। সারাদেশে আর্মির সাঁজোয়া গাড়ি ঢুকে পড়েছে। দু' একদিনের মধ্যে চাঁদপুরও আমক্রণ করবে এই শত্রু বাহিনী। মায়ের সঙ্গে গ্রামের বিএসসি পাস পরোপকারী অলি কাকুর নানান বিষয়ে আলাপ।
- বদি চিনতা কইরেন না! আমগো গেরামের বরো বোয়াল বাড়ীর জিন্নত, সরদার বাড়ীর শফিক আর আমি চানপুর গেছিলাম। আমগোরে ছোডখাডো একটা ট্রেনিং দিয়া দিসে! আমনেতো চিনেন হাজীগঞ্জ অলিপুরের জহিরুল হক পাঠানেরে? হেয় তো আরমি। পাটান ভাইয়ের কাছেই জুবলি ইস্কুল মাটে আমরা ত ট্রেনিং লইয়া আইলাম। আমড়া যুদ্ধ করচুম।
নিজের ছেলেরা মানে বাঘার বড়দা ও মেজদার কথা মনে করে মা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়েন।
- বাবুল স্বপনেরে দেকছো ?
- নাতো ?
- আচ্ছা বদি আমনেরা বলে রেডু আনছেন ?
- তুমিও যানচো দেহি!
- আমগো গেরামে কী এইডা আচে? বালাই অইলো সনদার সময় আমু সবাই মিইলা রেডু হুনতে!
- আইচ্চা ! কোনো সমস্যা নাই অলি!
বাঘা, সমীর ও মামুন মিলে বাঘাদের বৈঠকখানার ঘরে চৌকি, চেয়ার, টেবিল, টুল ও বইপত্র গুছালো। বেড়াতে এলে সমীরের সঙ্গে এ ঘরে শোয় বাঘা।
চাঁদপুর থেকে লোক মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন বাবা। চিঠিটা মার উদ্দেশ্যে লেখা! প্রিয়তমা নীলু, ভালবাসা জেনো। আশা করি তোমরা ভালো আছো। দেশের পরিস্থিতি ভালো না! যুদ্ধ শুরু হয়েছে। চাঁদপুর শহরেও আর্মি চলে এসেছে। খুব অত্যাচার করছে ওরা। ছেলেদের জামা কাপড় খুলে পরীক্ষা করে দেখে পাক আর্মিরা। কেউ কলমা না বলতে পারলে নির্ঘাত মৃত্যু! আমাদের চেনা কিছু পড়শী ওদের কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। সহযোগিতা দেয়। ওদের পক্ষ নিচ্ছে। ওদের কাছে খুবই অনিরাপদ বিশেষ করে মেয়েরা। আমি ওদের চিকিৎসা দিচ্ছি বলে কিছুটা নিরাপদ। আমার জন্য চিন্তা করো না। ইস্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। খবর পেলাম আমাদের ছেলে বাবুল ও স্বপন কলিকাতা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে চলে গেছে। টেলু ও সাগরীকে মনা মামার বাড়ী পিংড়া পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বিমল বোসের বাসায় রাতে থাকি। আকাশে বিমান মহড়া দিচ্ছে। ওপর থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অনাথ ও রবিকে বলবে ওরা যেন ঘরের আশেপাশে মাটিতে ট্যাংক করে রাখে। বাঘাটা দুষ্টু অনেক, ওকে নিয়ে ভয় বেশি। ইতি - কালী
চিঠিটা পড়ে এনট্র্যান্স পাশ মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনাথ ও রবি কাকুকে মাটির ট্যাংক খোঁড়ার বিষয়টা জানালেন। সন্ধ্যে হলেই অলি কাকুর নেতৃত্বে কিছু লোক আসে রেডিও শুনতে। তাদের কাঁধে থাকে রাইফেল! বৈঠকখানার সামনে বিশাল মাটির উঠোন। বিছানো বেতের তৈরি শীতল পাটির মাঝখানে কাঠের টুল পাতা। সবাই গোল হয়ে বসে শোনেন রেডিওর অনুষ্ঠান ও খবর। মাঝে মাঝে হাতে তালি দেন কেউ কেউ। আবার কোনো সময় মন খারাপ হয়ে যায় কারো কারো। অলি কাকুর মতো জিন্নত আলী কাকুও বাঘাকে আদর করেন। বাঘাকে তিনি ডাকেন টিবয়! প্রায় সময়ই তিনি বাঘার জন্য কাশিমপুর বাজার থেকে আনেন গোলাপী রঙের গোল লাঠি লজেন্স। অলি কাকু আনেন তিলের খাজা। যতক্ষণ বাঘাদের বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ ওনাদের সঙ্গ দেয় ও। বাঘা বুঝতে পারে দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ হচ্ছে! গ্লাসে করে জল এনে দেয়া, কেরোসিন তেলের কুপি বা হারিকেন সামনে নিয়ে ধরা, চা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ এসব কাজ বাঘা নিজের আনন্দেই করে থাকে। অলি কাকু গ্রামের মধ্যে বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি। বাঘার প্রশ্নবানে অলি কাকু মোটেও বিরক্ত হন না। তিনিও ওনার কার্যক্রমের অনেক কথা বলেন বাঘাকে। তাতে ও নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করে।
কাশিমপুর গ্রাম অনেকটা নিরাপদ। আর বাঘাদের বাড়ীতে সবার কম বেশি সহযোগিতা করেন অলি কাকু ও বন্ধুদের। মায়ের কথায় রবি কাকু তাদের গাছের ডাব পেড়ে দেন। তাদের মধ্যে মা খুঁজে পান বড়দা ও মেজদাকে। মুড়ি, চিড়া, নাড়ু মোয়া ও নানা ফল ফলাদি এসবও তাদের দেয়া হয়।

সবই মায়ের নির্দেশে। অতিথিকে দেবতা মনে করেন মা। বাঘাও এতে খুশী। সেও ভাবে সেবা দেয়া মানুষের উত্তম কাজ।
ক'দিন ধরে অলি কাকুরা আসেন না। এতে বাঘারও মন খারাপ হয়ে যায়। মা বুজান বাঘাকে।
- অত চিনতা কী? ওনারা দেসের জন্য লরতে গ্যাচেন। দেখিস আবার আইয়া পরবো!
জোসনাময় রাত! সাদা মেঘ হেঁটে যাচ্ছে আকাশের বুক আঁকড়ে ধরে। উঁকি মারছে সাদা থালার মতো উজ্জ্বল চাঁদ। সমীরকে সঙ্গে করে সারা উঠোন ঘুরেছে বাঘা। মাথা কাত করে ও তাকায় মধ্য গগণে। চোখ সরাচ্ছে না! এমন সময় চিৎকার শোনা গেলো বাড়ীর প্রবেশ মুখে। লাঠি নিয়ে দৌড়ে গেলো রবি কাকু। পিছু নিলো ওরা। কিন্তু কোন চোর বা ডাকাত নয়। তবে একটি দুঃসংবাদ! জিন্নত কাকু আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। ওনার বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে। বলাখালে কুমিলøা-চাঁদপুর সড়কের ঘটনা।গ্রামবাসীদের তোপের মুখে আম্মিরা সরে যায় গাড়ী নিয়ে। গুলি খেয়ে অনেক কষ্টে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেন জিন্নত কাকু। দু'দিন ছিলো সে বাড়ীতে। বেশ কষ্টে তাকে নিয়ে আসা হয় কাশিমপুর। অলি কাকু, শফিক কাকু ও রবি কাকু মিলে জিন্নত কাকুকে বৈঠকখানায় নিয়ে আসেন। সবাই মিলে চৌকিতে শুইয়ে দেন ওনাকে। রবি কাকু বললেন 'বালো হ আগে জিন্নত আলী। পরে খবর দিমু তগো বাইত।' দিনরাত সেবিকার মতো শুশ্রূষা করে যায় বাঘা। ক্ষতস্থানে পাহাড়েলতা পাতা কঁচলে রস লাগিয়ে দেয়। জিন্নত কাকু চিৎকার করে ওঠেন। মার কাছ থেকে ব্যান্ডিজ, তুলো ও ডেটল এনে তা দিয়ে জিন্নত কাকুর পা পরিষ্কার করে প্রতিদিন। বাঘা ওনাকে পায়খানাও ধরে নিয়ে যায়। মুখে খাবার তুলে দেয় অনেক সময়। তিনদিন পর জিন্নত কাকুকে ওনার বাড়ীর লোকজন এসে নিয়ে যান। আম্মির হাতে জিন্নত কাকুর আহত হওয়ার বিষয়টি সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। সন্ধ্যার সময় রেডিও শোনার আসরে নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে বাঘা। যুদ্ধের নানা বিষয় বাঘাকে গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন করে রাখে। মনে মনে পরিকল্পনা করে সে।
সকালে জল খাবারের পর দীঘির পাড়ে যায় বাঘা। পরিকল্পনা অনুযায়ী নজরুল ও মামুন আসে। জিন্নত কাকুর কাছে শুনেছে গাড়ী যে অবধি চলে সেখান পর্যন্ত আর্মি আসতে পারে। রামপুর পর্যন্ত আম্মির গাড়ী আসে! ওরা তিনজন কাশিমপুর বাজার হয়ে রামপুরের দিকে হাঁটতে থাকে।
বাঘা কোথায়? বাড়ীতে রব পড়ে গেলো! এ বাড়ী ও বাড়ী খোঁজ নিলেন কাকুরা। কোথাও সে নেই। বাঘা নিখোঁজ! হারিয়ে যাওয়া বাঘার চিন্তায় মা বিচলিত হয়ে পড়েন।
ক'দিন আগে রবি কাকুর কাছে বাঘা জানতে চেয়েছিলো মামাতো ভাই সুবলদাদের বাড়ীর ঠিকানা। কাকু বাঘাকে জানায় রামপুরের পাশে উরপুর যতীন্দ্র সেনের বাড়ী। মাকে রবি কাকু আশ্বস্ত করে বললেন 'আমি দেকছি বড় বদি! কোনো চিনতা কইরেন না। উরপুর বিদুর বাড়ী যাইয়া দেহি।'
বোন বিদেশীনী সেনের বাড়ী গিয়ে রবি কাকু দেখেন বাঘা জড়সড় হয়ে মাটির ঘরে শুয়ে আছে। গুড় মুড়ি খেয়ে পিসির বাড়ী থেকে আতংকের মধ্যে রওনা দিলো ওরা। বিকেলে হাঁটা পথে যেতে যেতে কাকু উরপুর আসার পুরো ঘটনা জানতে চাইলেন।
- আর বইলেø না ছোট কাকু! ওরাই তো জিন্নত কাকুরে গুলি করছে! অগরে ছারন যায় কও ? গাড়ী দেইখ্যা ডিল মারছি আমরা! আমগোরে অসরো ওচাইয়া দৌওরানি দিচে। পরে অরা ভাগচে!
- মামুন ও নজরুল কই?
- কইতে পারচ্ম না!
- এইডা ঠিক অইল না বাবা? আইচকা যদি কিচু অইয়া যাইতো?
কাকুর কথা শুনে মাথা নিচু হয়ে যায় বাঘার। একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় দু'জন। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বাঘা বলে ওঠে -
আমারো যুদ্ধ করতে অইবো। দ্যাশে শতরচ ভইরা গ্যাছে! ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসেন আর মাথা নাড়েন কাকু।

 # লেখক গল্পকার, কবি ও সাংবাদিক
২৫ আগস্ট, ২০২০, সিদ্ধেশ্বরী, রমনা, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

মানব ইতিহাসের আফসুস

মো: শাহনেওয়াজ ফাহাদ

সরকার লাগাতার কারফিউ দিয়েছে। চারপাশে এক থমে থমে পরিবেশ। বাতাশে গুঞ্জন, চাপা উত্তেজনা, করিম মিয়া একা থাকেন, নদীর এপারে কেরানীগঞ্জে তার দোকান। হরেক রকম পণ্যের পশরা। দোকানের নাম দি ভ্যারাইটি স্টোর। তিনি রোজ ভোরে উঠে নদীর ওপারে যান, ঢাকায় ডুকেন, মাল সামাল কিনেন। আর নৌকা পারাপারের সময় কথা হয় তার কোন না কোন খদ্দেরের সাথে, প্রতিদিনই কেউ না কেউ থাকেই নৌকায়। তবে তার সব থেকে ভালো লাগে রক্তিম কে, পুরা নাম রক্তিম চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে থাকলেও সকাল সকাল এপারে একবার মায়ের সাথে দেখা করে যায়। রক্তিমের হাসি সর্বদা তার সঙ্গী। সবসময় তার আশে পাশের মানুষকে হাসানো, খুশি দেওয়া নতুন নেশা। তব সব চাইতে বড় নেশা পেয়েছিলো হক আদায়ের নেশা। এ নেশা ছিলো নিজেদের ভোটের হক। প্রতিদিন কোন না কোন মিটিং চলছেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া, তবে করনীয় কি? সে নিয়ে অনেকের চিন্তার খোরকেও ঘুণে ধরে যাচ্ছে। কেবল বিকালের টিউশনির সময়টা বাদে। এই সময় সে রাহি-মাহিদের পড়াতে যায়। রাহি-মাহি দুষ্ট তবে তুখোড়। রক্তিমের সখ, খুব সখ সে তার প্রথম আয় দিয়ে প্রিয় মানুষদের অনেক অনেক গিফট দিবে। রাহি-মাহি একটা বাশি চেয়েছিলো, মাসের শেষেই দিয়ে দিবে ভেবেছিলো কেনা হয়নি। মাসের মাঝামাঝি বেতনটাও চলে আসলো, যথারীতি এক এক করে মায়ের জন্য শাড়ি, বাবার জন্য একটা কেসিও ঘড়ি আর করিম চাচার জন্য একটা বাংলা তর্জমা করা কোরআন শরীফ কিনেছে। করিম চাচাতো কতো বার ফ্রী ফ্রী লজেন্স দিতো, কখনো রক্তিম থেকে পয়সা নিতো নাহ। তারজন্য এই অমূল্য উপহার নেহাতই অমূল্য। রাহি-মাহিদের জন্য এক জোড়া বাশি কিনেছে রক্তিম।
সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরে এলো, কারফিউর দামামা পূর্ণ দমে। সবগুলা উপহার তার টেবিলে, সকাল হলেই এক এক করে দিয়ে দিবে আর সবার হাসিটা টুকে দিবে নিজের মনে। হঠাৎ বিকট শব্দ, জগন্নাথ হলের আকাশ বাতাস প্রকম্পিতো। পাক হানাদারদের বুটের আওয়াজ যেনো ভূমিতে বেদনার আর্তনাদ সৃষ্টি করে ভয়াল ২৫ শে মাচের্র কালোরাতে।

রক্তিমকে আর পাওয়া যায়নি, হয়তো সে রাতে কোথাও তারো সমাধি হয়ে গেছে। শত ক্ষতের মাঝেও সে রাহি-মাহিদের জন্য কেনা বাঁশি, মায়ের শাড়ি, বাবার জন্য কেনা কেসিও ঘড়িটা আর করিম চাচার জন্য কেনা তর্জমাসহ কোরান শরীফ পাওয়া গেছিলো।

জানা যায়নি, কেসিও ঘড়িটা রক্তিমের বাবা পড়েন কিনা? জানা যায়নি রাহি-মাহি বাশি বাজানো শিখেছিলো কিনা। কিন্তু করিম মিয়া ঠিকই তর্জমাসহ কোরআন পড়েছে, শুনা যায় সে যুদ্ধের ট্রেইনিং এ গেছে। পাক হানাদারদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায়, কারণ সে কোরানের কোন আয়াতে পায়নি কোন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করা যায়েজ কিংবা সোয়াবের কাজ। কি আজীব, ধর্মের দামামা বাজিয়ে তারা লড়াই চায়,সংঘাত চায় অথচ ধর্মের মূলটাইতো শান্তির।
মাঝে মাঝে করিম মিয়া ভাবে, সেই রাতের জগন্নাথ হলের গণহত্যা নিয়ে ভাবে।
আর আফসুস করে "ইস যদি তার একটা বইয়ের দোকান থাকতো, সব পাক হানাদারদের তর্জমাকরা কোরান শরীফ দিতো
তাহলে হয়তো ধর্মের নামে তারা গণহত্যায় মাততো না।
ইস আফসুস, এ এক অনন্তকালের মানব ইতিহাসের আফসুস।

লেখক শিক্ষার্থী

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

আপনার সাথে মুহূর্তভর বৃষ্টি বিলাস

নৌশিন সাঈদা

বছরের প্রথম বৃষ্টি হচ্ছে আজকে। বৃষ্টি আমার একটুও পছন্দ না। বৃষ্টির একটু পানি মাথায় গড়াতেই সর্দি, জ্বর বাঁধিয়ে বসি। গতবার এমন সময় লিপিদের বাসা থেকে আসার সময়, সে কি বৃষ্টি! একটুখানি পথেই ভিজে নাজেহাল অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো ছিল আমার।
বাসায় এসে সর্দিকাশি মাথাব্যথা সব একদিনেই বাঁধিয়ে দিয়েছিলাম।পরের দিন পরীক্ষা দিয়েছিলাম কাঁপতে কাঁপতে। অনার্স ফাইনাল ইয়ারের শেষ পরীক্ষা।
আমি বুঝি, বৃষ্টির আমার সাথে ভীষণ শত্রুতা। তাই আমি তাকে অপছন্দ করি একদম মুখের উপর বলে দিই।
বৃষ্টি শুরু হওয়াতে লোড শেডিং হয়ে গেছে। সবগুলো ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে কালো মেঘের জন্য। আলো নেই তেমন। সব রুমের জানালা গুলো বন্ধ করে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছি। যদিও আমার ঘরে আলো আছে মোট-ামুটি। আমার রুমের জানালাটাও খুলে রেখেছি। বাতাস বইছে সাথে বৃষ্টি। বাসা পুরোটাই খালি। সবাই নানা শ্বশুরের বাড়ি গেছেন। আমি আর আমার উনি ছাড়া। আমার যাওয়ার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। তবে শাশুড়ি মা আমাকে সোজা না বলে দিলেন। আরো বললেন পরেরবার উনার সাথে পাঠাবেন। কিছু বলার সুযোগও দিলেন না। উনিও একটিবার যেতে চাইলেন না। ভারি রাগ লেগেছিলো সকাল বেলায়।
আমার শাশুড়ি আম্মার উপর না। একটুও না।আমি ওনার মতো সরল মনের মানুষ খুব কম দেখেছি।উনার মনের কথাগুলোই মুখে আসে সবসময়।বড্ড ভালোবেসে আগলেছেন আমায়।
এইতো সেদিন চুল উস্কো খুস্কো দেখে সোজা একবাটি তেল নিয়ে আমাকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে কি বকুনি! তারপর মাথায় তেল দিয়ে বেনুনি করে দিলেন।আমার চোখে ভালোবাসার অশ্রু কখন না কখন এসে গড়িয়ে পড়ে। আমি উনাকে জড়িয়ে ধরলাম আচমকা!
তিনি আমার পিঠে একহাতে স্নেহের বুলান দিয়ে বললেন- তুমি আমার মেয়ে, নূরা।
আমার অশ্রুগুলো উনার পিঠেই গড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। বিয়ের দুমাস হলো। তবে মনে হয় যেন ওদের সাথে আমার মায়ার সম্পর্ক অনেক বছরের।
বাবা আমাকে পছন্দ করে এনেছেন। তবে মায়ের সাথে যে সম্পর্কে বেঁধেছি তা সবচেয়ে প্রিয় কিছু।
বৃষ্টি তার গতি বাড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশের কালো মেঘের মেলা শেষ করেই আজ থামবে জেদ ধরেছে বোধ হয়। পুরো বাসায় আমি একা ঘুরাঘুরি করে বেড়াচ্ছি।
আমাকে যেতে দিলে কি এমন হতো।আমি জানি, খুব করেই জানি। উনি আম্মাকে আমাকে নিয়ে যেতে মানা করেছেন। নিজে ঠিকিই অফিস চলে গেছে। আমি সারাদিন বাসায় কি করব। যা কাজ ছিলো সব টুকটাক গুছিয়ে নিয়েছি। ইশ্, যদি নানা শ্বশুরের বাড়ি যেতাম কতো মজা হতো।সব উনার দোষ।
মোবাইলে মেসেজের টোনটা বেজে উঠল।এতোক্ষণ আমি মোবাইলের কথা ভুলেই গেছিলাম।হুমমমম, আমাকে যেতে দেয়নি তো, ঠিক আছে। সারাদিন কল আর মেসেজেস দিয়ে এতো বিরক্ত করব বুঝবে কেমন লাগে।
দৌড়ে মোবাইলটা হাতে নিলাম।
এ কি! আমি এদিকে উনাকে বিরক্ত করব ভাবলাম, কিন্তু উল্টো উনি আমাকে বিরক্ত হবার জন্য মেসেজে দিয়েছেন। মুচকি হাসতে হাসতে মেসেজটা ওপেন করলাম।মেসেজটা ওপেন করেই আমি ভীষণ অবাক!
উনি লিখেছেন- একটু ছাদে আসবেন? আপনার সাথে বৃষ্টি বিলাস মুহূর্তভর করতে চাই।
আমি অনেকটা অবাক হয়েছি।আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন একসাথে আসছে।
উনার অফিস এতো তাড়াতাড়ি ছুটি? সবচেয়ে চিন্তার বিষয় উনি বাসায় ঢুকলেন কিভাবে? বাসায় মেইনডোর তো অফ। দেওয়াল টপকে?
কি সব ভাবছি!
ও মনে পড়েছে উনার কাছে বাসার আর একটা চাবি থাকে। উফ্, আমিও না।
কিন্তু উনি আমায় এই বৃষ্টিতে ছাদে ডাকছেন কেন? উনিও বাসায় ঢুকে রুমে না এসে এই বৃষ্টিতে ছাদে কি করছেন। ইশশ্, বৃষ্টির সাথে যে আমার ভীষণ শত্রুতা। এ কথা আমি উনাকে কিভাবে বলি।
বিয়ের পর এই প্রথম তিনি কিছু আবদার করছেন।উনার এই আবদার না রাখা কি ঠিক হবে?
যদিও আমি কখনো প্রেমে পড়িনি। তবে বিয়ের প্রথম রাতে তার একটি কথা আমার হৃদয়কে এদিক থেকে ছুঁয়ে ওদিকে ঘর বেঁধেছে সারাজীবনের জন্য। আমি উনার দিকে অপলক তাকিয়ে উপলব্ধি করছিলাম।
এতোটা ভাগ্যবতী আমি হবো কখনো ভাবিনি।
ঘরে ঢুকে সালাম দেওয়ার পর যখন উনি আমাকে আপনি,আপনিচ করে সম্বোধন করেছিলেন তখন উনার মনের দুটানা কাটাতে আমি বললাম- আপনি আমাকে তুমি করে বলুন। অধিকার আছে আপনার, সমস্যা নেই।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন- নূরা! আমি আপনাকে ভালোবাসা এবং সম্মান দুটোই দিতে চাই।
তবে ভালোবাসার আগে সম্মান দিতে চাই। যতোটুকু আপনার অধিকার তার চেয়ে বেশি দিবার চেষ্টা করব, নূরা।আপনার হৃদয়ে সম্মান আমি হতে শুরু এবং আমি পর্যন্ত ভালোবাসায় যাতে পূর্ণ হয়।
আমি পূর্ণতার চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।
স্কুল, কলেজ পেরিয়ে ভার্সিটি জীবনেও কখনো প্রেমের ছিটেফোঁটাতেও জড়াই নি।ছেলে বন্ধু বানায়নি বললেই চলে। এমনটা নয় যে বন্ধু বানালে কিংবা মেলামেশা করলে খুব একটা অসুবিধে হতো।তবে আমি এসব বিষয় দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম।মনের পবিএতা নষ্ট করতে চাইনি কখনো বেড়াজালে। মোটকথা, এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়নি কখনো তেমনভাবে।
উনার কথা বলার ধরন ভীষণ সুন্দর, ঠিক মানুষটির মতোই। সেদিন আব্বা আমার হাত তার হাতে তুলে দিতে গিয়ে কেঁদে দিয়ে কিছুই বলতে পারেন নি।উনি আমার হাতটা আলতো করে ধরে বললেন- আব্বা, উনার যত ভালোলাগা আছে সব উনার জীবনে ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিবো।উনার প্রতি দায়িত্বে একটুও ত্রুটি আমি করবো না, আব্বা। আমি আব্বার চোখে স্পষ্ট দেখলাম- আব্বার চোখগুলো ছলছল করতে লাগলো।
উনি আব্বার চোখে সোজা তাকিয়ে আরো বললেন- আপনার হৃদয়কে আমার ভালোবাসা করে নিয়ে যাচ্ছি।
আমি শুধু দেখেই যাচ্ছিলাম উনাকে সেদিন।
এমন সৌভাগ্যবতী হয়ে আমি তার এইটুকু আবদার কিছুতেই না করতে পারি না। বৃষ্টির সাথে শত্রুতার ইতি টেনে, আজ সর্দি জ্বর বাঁধলে বাঁধুক ভেবে সোজা ছাদের দিকে রওনা দিলাম। সিঁড়ি বেয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালাম একদম। দরজা থেকে দাঁড়িয়ে উনাকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম।এদিক হতে ওদিক তাকাতেই হঠাৎ উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।
পুরো ভিজে গেছে উনি। বৃষ্টির পানি তার সারা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।আমি উনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম- যদি জ্বর হয়ে যায়, আপনার? সর্দি বাঁধান? তখন কেমন হবে বলুনতো?
উনি বললেন- এরকম কিচ্ছু হবে না, নূরা। তবে আজ যদি আপনি আমার হাত না ধরেন। এই বৃষ্টি বিলাস আমার সাথে উপভোগ না করেন তবে অফিস থেকে এসে কাক ভেজা ভিজে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে হাত বাড়িয়ে এই নির্মল বৃষ্টি উপভোগ করতে পারিনি ভেবে আফসোস ধরে রাখতে হবে সারাজীবন।
আমি হুট করেই হেসে দিলাম। উনার মুখেও প্রাপ্তির আগ মুহূত্বের হাসি। আমি উনার হাতটা ধরে এ বিশাল আকাশের বুক থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ফোঁটায় ভিজতে ভিজতে আমার হাত ধরে হাঁটতে থাকা আকাশের বুকে মাথা রাখলাম।উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবার। আর আমি ভাবতে লাগলাম, এই আকাশের বিশালতায় সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী বুঝি আমি।
উনি আমায় আলতো করে জড়িয়ে ধরলেন এবার। আর বললেন- ভালোবাসি, নূরা।
আমি উনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে বললাম- সারাজীবন ভাসবেন তো?
উনি এবার আমার চিবুক ধরে মুখটা উঠিয়ে আমার কপালে ভালোবাসা আঁকলেন।
আচ্ছা! এভাবে কি থাকা যায় না? (মনে মনে নিজেকেই বললাম)
উনি এবার বললেন- সারাজীবন বাসবো, নূরা।
আমি আবার উনার বুকে মাথা গুঁজে চোখ বুজে বললাম- আমিও আপনাকে অনেক ভালোবাসি, আকাশ।
উনি বললেন- হুম জানি। যদি ভালোই না ভাসতেন তা হলে কি সর্দি জ্বর আর বৃষ্টির সাথে এতো বছরের খুনসুটি কাটিয়ে আসতেন না কি কখনো।
আমি চোখ খুললাম। কি বলবো বুঝতে পারছি না।খুব বিস্ময় নিয়ে উনার দিকে তাকিয়ে আছি। উনি আমার চোখের প্রশ্ন পড়ে ফেললেন মুহূর্তে।
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন- হুম, আমি জানি। বৃষ্টি থেমে গেছে, নূরা।
চলুন নিচে যাই। আজ আপনাকে আমি চা বানিয়ে খাওয়াবো। বৃষ্টি বিলাস চা।বলেই মুচকি হাসলেন। এ হাসির অর্থ কি জানি না। তবে প্রাপ্তির হাসি বোধ হয়।
আমি মানুষটির প্রত্যেকটি ব্যবহারে মুগ্ধ হচ্ছি বারংবার। এতো মুগ্ধতা কখনো ভর করেনি আগে।
আমি কি মুগ্ধতার অসুখ বাঁধাবো নাকি?
নূরা! শাড়ি ভিজে পুরো শেষ। জ্বর, সর্দি বাঁধাবেন নিশ্চয়ই। উনার ডাকে ঘোর ভাঙ্গল।
এবার উনি আমার হাত দুটো আলতো করে ধরে বললেন- প্রথমত, ধন্যবাদ। আমাকে এতো সুন্দর একটা মুহূর্ত দিবার জন্য।
আর দ্বিতীয়ত, দুঃখিত। আমার এই বাচ্চা বাচ্চা আবদার রাখতে আপনার অসুখ বাঁধাতে হলো।
আমি উনার দিকে তাকালাম- এ অসুখ মুগ্ধতার অসুখ।তিনি আর কিছু বলার আগেই নিচে নেমে আসলাম। তিনি বোধ হয় এখনো দাঁড়িয়ে আছেন বৃষ্টিহীন বিলাসে।
আমি বোধহয় এই বিশালতায় সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী একজন।
আমি মুচকি হাসলাম।

লেখক শিক্ষার্থী

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

নিলিশা

অংকুর রায় অনিক

- এক্সকিউজ মি
- জ্বি বলুন।
- আপনি কি আমাকে জানালার পাশে বসতে দিবেন। আসলে বাসে উঠলে আমার বমি হয় মাঝে মাঝে এজন্য বললাম।
- তাহলে বাসে উঠেন কেন? বিরক্ত হয়ে বলল অভি। অন্য কোনো মেয়ে হলে অভির প্রশ্ন শুনে রেগে যেত। কিন্তু মেয়েটি শান্ত গলায় বলল,
- আচ্ছা আপনার সমস্যা হলে থাক। আমি এখানেই বসছি। মেয়েটির শান্ত স্বভাব দেখে অভির ভালো লাগলো এজন্য সে সিটটা ছেড়ে দিয়ে পাশের সিটটিতে বসল। নতুবা লং জার্নিতে সে জানালার পাশের সিট ছাড়া বসে না।
-ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া।
-ইটস ওকে।
-কোথায় যাচ্ছেন আপনি ভাইয়া?
- কেন আপনি কি যাবেন আমার সাথে!
- না এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। আপনি আমার কথাতে বিরক্ত হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।
এই বলে মেয়েটি জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। অভি সাধারণত কারো সাথে এমনভাবে কথা বলে না। কিন্তু আজ সে প্রচন্ডভাবে রেগে আছে। যে কারণে কারো ভালো কথাতেও তার রাগ উঠে যাচ্ছে। আজ তার অফিসের বস তাকে অনেক বকাবকি করেছে। এজন্য সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজধানী থেকে রাজশাহী যাচ্ছে।
কিছুক্ষণ পরে অভি খেয়াল করল মেয়েটি কান্না করছে।
-এই আপনি কান্না করছেন কেন কি হয়েছে?
মেয়েটি তাকালো অভির দিকে। অতক্ষণ অভি মেয়েটির দিকে তাকায় নাই ভালোভাবে কেননা সে অফিসের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছিল। সে দেখল মেয়েটি অনেক ফর্সা। দারুণ সুন্দরী মেয়ে। বয়স ২০/২১ হবে।
- কালকে রাতে আমার মা মারা গেছেন।
এটা শুনে অভির অনেক খারাপ লাগল। এই মেয়ের সাথে সে অনেক খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে। মেয়েটি হয়ত তার ব্যবহারে অনেক কষ্ট পেয়েছে।
- আসলে আমি দুঃখিত। আমি আপনার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করবেন প্লিজ। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?
- বাড়িতে যাচ্ছি মায়ের কাছে। (মেয়েটির কান্নার বেগ বেড়ে গেল খানিকটা)
- আপনি শান্ত হন প্লিজ। আমাদের সবাইকেই তো মরতে হবে তাই না। আপনি এভাবে ভেঙে পড়বেন না। আপনি কি ঢাকায় থেকে পড়ালেখা করেন?
- না, আমি আমার স্বামীর সাথে থাকি ঢাকাতে।
- সে কোথায়?
- সে কাজে ব্যস্ত আছে একারণে আসতে পারেনি আমার সাথে।
-বলেন কি! আপনার মা মারা গেছেন আর সে যাবে না আপনার সাথে !
- সে আমাদের বাড়িতে একবারই গিয়েছিল। যখন আমাদের বিয়ে হয়। তারপরে আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। সে আর যায় নাই আমাদের বাড়িতে। আমাকেও যেতে দেয়নি।
- কেন?
- সে অনেক বড়লোক আমরা অনেক গবির একারণে তার সম্মানে বাঁধা পায়। ছোটবেলাতে আমার বাবা মারা যান। মা আমাকে বড় করেন। চাচারা বড়লোক ছেলের সাথে আমার বিয়ে দেন যাতে আমি সুখে শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু ঘটল উল্টোটা।
- আপনি আপনার মাকে আপনার সাথে নিয়ে আসতেন।
- আনতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার স্বামী আনতে দেয়নি। সে বলেছে আমার বাসা কোনো বৃদ্ধাশ্রম না। প্রয়োজনে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে বলেছিল।
-আপনার কোনো ভাই-বোন নেই?
- না।
মেয়েটিকে দেখে অভির মনে হলো মেয়েটির রূপই হয়তো মেয়েটির কষ্টের কারণ। কেননা অনেক গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়েদের দ্বিগুণ বয়সী কোনো বড়লোক তাদেরকে গ্রাম থেকে বিয়ে করে এনে শহরে ঘরে বন্দি করে রাখে শুধুমাত্র তাদের রূপের মোহে।
- আপনার মা মারা গেলেন কিভাবে? আগে থেকে কি অসুস্থ ছিলেন? জিজ্ঞাসা করল অভি।
- না। তার জটিল কোনো রোগ ছিল না। কালকে সন্ধ্যার দিকে ঘুমিয়ে যায় মা। আমার চাচাতো বোন মল্লিকা রাত ৯টার দিকে মাকে খাবার খেতে আসার জন্য ডাকতে যায়। তখন দেখে মা আর নেই। এটা বলে মেয়েটা আবারো কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ কান্না করার পরে মেয়েটি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, আমাকে ৯টা ৫ মিনিটে ফোন করে জানায় আমার বড় চাচা। আমি তখনই বাড়িতে যেতে চাই। আমি আমার স্বামীকে মায়ের মৃত্যুর কথা জানালে সে বলল দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে বেহেস্ত নসিব করুন। আমি বললাম আপনি আমার সাথে চলুন না এখন বাড়িতে। সে বলল কালকে আমাকে

চট্টগ্রাম যেতে হবে ঐখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। আর আমি গেলেই তো তোমার মা আবার জীবিত হয়ে যাবেন না। আমি তখন বললাম, বেশ আপনাকে যেতে হবে না।ড্রাইভারকে দয়া করে যদি বলতেন আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসতে তাহলে আমার অনেক উপকার হতো। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল আমি বললাম না কালকে আমাকে চট্টগ্রামে যেতে হবে! কালকে সকালে বাসে করে চলে যেও। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। কারণ তাকে আমি অনেক ভয় পাই আর এখন সে ছাড়া এই দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। জানেন আমি কালকে সারারাত আমি কান্না করেছি আর মাকে দেখির জন্য ছটফট করেছি।

অভি বুঝতে পারলো যে মেয়েটি খুব অসহায়। এমনকি সে কথাগুলো বলার জন্য কোনো লোকও পায় না। হয়তো একারণে স্বচ্ছন্দে নিজের মনের কথাগুলো বলে দিচ্ছে অভিকে। মনে হচ্ছে অভি যেন তার পূর্ব পরিচিত।

- আপনার শ্বশুর, শাশুড়ি কিছু বললো না আপনার স্বামীকে?
- তারা দুইজনই মারা গেছেন।
- ওহ আচ্ছা। আপনার ছেলে-মেয়ে নেই?
- না।
- কয় বছর হল আপনার বিয়ে হয়েছে?
- ৩ বছর। আমি যখন ইন্টার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তখনই আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বড়লোক পাত্র পেয়ে হাতছাড়া করতে চায়নি আমার চাচারা। আমার মা ও খুব খুশি হয়েছিল এমন ধনী জামাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হবে দেখে যদিও তখন আমার স্বামীর বয়স ছিল ৪৫ বছর আর পূর্বে ৪২ বছর বয়সে একবার বিয়ে করেছিল কিন্তু বিয়ের দুই-বছর হতে না হতেই তার বউ ফেসবুকে প্রেম করে এক ছেলের সাথে পালিয়ে যায়। তারপরে আমাদের বিয়ে হল আর আমাকে নিয়ে আসলো ঢাকাতে। তার আগের বউ পালিয়ে যাওয়াতে আমাকে ঘর থেকেই বের হতে দেয় না। ফেসবুক/ইমো এগুলো চালানো নিষেধ। আমি বাটন ফোন ব্যবহার করি।

-ওহ আচ্ছা। আপনার নামটাই তো জানা হলো না?
- আমার নাম নিলিশা। আপনার নাম কি?
- আমার নাম অভি। আপনার বাড়ি কোথায়?
- নাটরের দয়ারামপুরে। আপনার?
- আমার বাড়ি রাজশাহীর মোহনপুর।

নিলিশার কথা শুনতে শুনতে অভির অফিসের ঝামেলার কথা সব ভুলে গেল। আর নিলিশাও মনে খুলে কথা বলতে পেরে কিছুটা হালকা বোধ করছে নিজেকে।

-আপনার ফোন নাম্বারটা কি পেতে পারি?
- হ্যাঁ অবশ্যই।

দুইজন দুজনের ফোন নাম্বার আদান প্রদান করল। একপর্যায়ে বাস নাটরে পৌঁছালে নেমে গেলে নিলিশা। অভির পাশের সিটটি শূন্য পড়ে রইল। এই সময়ের মধ্যেই নিলিশাকে তার আপন মনে হতে লাগলো। এই মেয়েটির প্রতি তার একটা মায়া কাজ করতে লাগল। যখন মেয়েটি কান্না করছিল তখন তাকে অনেক মোহনীয় লাগছিল। তার মুখ, নাক লাল হয়ে ছিল। দেখতে অসম্ভব মায়াবী লাগছিল। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে বাস পৌঁছে গেল রাজশাহী। এবার বাস থেকে নেমে গেল অভি। এখনো নি-লিশার ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে নিজেকে বুঝাতে লাগলো নিলিশা বিবাহিত তাকে নিয়ে ভাবা যাবে না।

অভি বাড়িতে পৌঁছাল সন্ধ্যার আগে। বাড়িতে তার দুই বড় ভাই ও তাদের স্ত্রী এবং তার মা থাকেন। তার মা তাকে দেখে অবাক হল।

- কিরে কিছু না জানিয়ে চলে এলি যে? অসুখ করেছে নাকি?
- না মা। চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।
- কেন?
- বস ভালো না। তুমি চিন্তা করিও না মা। আমার অন্য জায়গাতে চাকরির কথা চলছে। কিন্তু ১০/১২ দিন দেরি হবে তাই ভাবলাম বাড়ি থেকে ঘুরে যাই।
- বাবা তোর তো বয়স কম হল না। এখন তো বিয়ে শাদি করতে হবে তাই না।
- করবো মা। আর কয়েকটা মাস সময় দাও আমাকে।

রাতের বেলা সে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। এখন তার খুব ইচ্ছা হচ্ছে নিলিশাকে ফোন দিতে কিন্তু সে দিবে না। কারণ এটা ভালো দেখায় না। সে নিলিশার ফোনের অপেক্ষায় থাকল। সেদিন নিলিশার কোনো ফোন কল আসলো না। পরের দিন বিকেলে ফোন দিল নিলিশা।

-কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করল নিলিশা।
-ভালো। আপনি কেমন আছেন?
- এইতো ভালোই আছি। আচ্ছা আপনি কালকে আমার সাথে দেখা করতে পারবেন ? আপনার সাথে কথা ছিল কিছু।
- হ্যাঁ। কখন আর কোথায় দেখা করবো বলুন ?

নিলিশা দেখা করার স্থান আর সময় বলে দিল। অভির মনে মনে ভাবল যে হয়তো আগামীকাল নিলিশা অভিকে প্রেমের প্রস্তাব দিবে। উত্তেজনা কাজ করছিল অভির মধ্যে। তার

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

জীবনেও হয়তো প্রেমে আসতে চলেছে তাও এত সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে। যদিও মেয়েটি বিবাহিত তবে মেয়েটি চাইলেই তো তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে তার কাছে চলে আসতে পারবে। এমন লোকের সাথে সংসার করা যায় নাকি! এমন লোকের বউ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। মনে মনে এগুলো ভাবতে লাগলো অভি।

সকাল এখন দশটা নাটোর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে বসে অভি নিলিশার জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নি-লিশা এসে হাজির হল। আজ অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে নিলিশাকে। লাল রঙের একটি ড্রেস পড়ে এসেছে নিলিশা। অভি তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। নিলিশা এসে অভির সামনে গিয়ে বসল। অভির মনে উত্তেজনা কাজ করছে। অবশেষে অভির গতরাতের চিন্তাগুলি সত্যি করে দিয়ে নিলিশা বললো,

- আমি তোমাকে ভালবাসি অভি। জানি না কি করে এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম। তুমি কি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে অভি?

অভির বুক ধড়ফড় করছিল এ সুন্দরী মেয়েটির কথা শুনে। মনের মধ্যে অপার আনন্দও খেলা করছিল। যেন সবকিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার।

- তুমি আমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছো? একদিনের দেখাতে ভালোবাসা হয় কিভাবে!

- জানি না আমি। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। তোমার সাথে কথা বলার পরে মনে হয়েছে তুমি আমার অপরিচিত কেউ না। তুমি আমার অনেক দিনের পরিচিত আপনজন।

অভি যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে মেয়েটি তাকে ভালোবাসে তাও একদিনের দেখাতে।

- আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি নিলিশা। তুমি কি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে পারবে?

- আমি স্বামীকে ডির্ভোস দিতে পারবো না। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করবো অভি।

- তোমার স্বামীকে ডির্ভোস দিতে পারবে না কেন? অনেক ভয় পাও তাকে ? এত ভয় কিসের আমি তো আছি তোমার সাথে।

- তুমি আছো দেখেই ভরসা পাচ্ছি অভি। তুমি কি আমাকে নিয়ে পালাতে পারবো?

- পালাবো কেন। তুমি তোমার স্বামীকে ডির্ভোস দাও আমরা আইনসম্মত ভাবেই বিয়ে করবো।

- ডির্ভোস দেওয়া তো সম্ভব না অভি।

- কেন? বললাম তো আমি আছি তোমার সাথে তাও কেন এত ভয় পাচ্ছো!

- কারণ আমি তাকে খুন করে ফেলেছি (বলেই কেঁদে ফেললো নিলিশা)।

অভি হতবাক হয়ে গেল নিলিশার কথা শুনে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল তার।

- কি বলো! কেন? কিভাবে?

- বিয়ের পরে থেকেই তিনি আমাকে নানাভাবে অত্যাচার করেছেন। আমাকে কখনো ভালবাসা দেন নি। শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্য হিসেবেই আমাকে ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো ভালোভাবে আমার সাথে কথা বলেননি। আমার কোনো কথা কখনো শুনেননি কখনো। নিজের মত নিজে থেকেছেন আমাকে ঘরে বন্দি করে। সবকিছু মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মা যেই রাতে মারা গেল সে তখনো আমার সাথে যেতে রাজি হল না। এমনকি আমাকেও যেতে দিল না। বিয়ের পরে ৩ বছরে মায়ের মুখ-খানা একটিবারও দেখিনি। আগে কত আকুতি মিনতি করেছি মাকে দেখতে যাওয়ার জন্য কিন্তু সে আমাকে যেতে দেয়নি। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনেও তার এই ব্যবহার দেখে আমার প্রচন্ড রাগ উঠে এবং আমি নিজের রাগকে সামলাতে না পেরে ফুল রাখার মাটির পাত্র দিয়ে পিছন থেকে তার মাথায় জোর বাড়ি দিই। সাথে সাথে তার মাথা দিয়ে প্রচন্ড রক্ত বের হতে থাকে এবং সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পরে থাকে। একসময় ফ্লোরে পরে থাকা রক্ত সব জমাট বাঁধতে থাকতে। প্রবল রক্তপাতের ফলে সে মারা যায়। আর আমি পাই তার কাছ থেকে মুক্তি। পরেরদিন আমি তার লাশ বড় ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে চলে আসি বাসা থেকে। তারপরে বাসে তোমার সাথে দেখা।

অভি কথাগুলো শুনে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। বিস্ময় দৃষ্টিতে নিলিশার দিকে তাকিয়ে রইল আর ভাবল এমন সুন্দরী মেয়েও খুনি হতে পারে!

লেখক শিক্ষার্থী

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

অকৃত্রিম হাসি

মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

আমি অনেকটা ঘরকুনো স্বভাবের। কেন জানি ঘরে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। খুব অল্প অল্প সময়ই রাস্তায় হাঁটি। ২০০৭ সাল থেকে শহুরে জীবনের সাথে একান্ত বুঝাপড়া চলছে। এরমধ্যে ঢাকা শহরেই বেশিরভাগ সময় থাকতে হয়েছে। এই শহরটা জীবনের মানে বুঝতে খুব বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি রাস্তায় হাঁটলে আশেপাশের দৃশ্যমান কোন ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও অবচেতন মনেই দাগ কাটে। রাস্তার মানুষগুলোর জীবনাচারণ আমাকে প্রতিনিয়ত নিভৃতে কাঁদায়। কত হাজার রকম অভিজ্ঞতা তৈরি করে হিসেব রাখা দায়। কেউ কেউ সহজ আয়ের উৎস হিসেবে অসুস্থতার ভান করে ভিক্ষার মতো নিকৃষ্ট পেশায় জড়ায়। আবার পাশেই দেখি কোন এক পঙ্গু ব্যক্তি হাজারো বাধা ডিঙিয়ে সৎপথে উপার্জনের অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। রাস্তায় বের হলেই এমন শত শত ঘটনা। এত এত অসহায় মানুষের ভিড় ঠেলেই আমরা প্রত্যেকদিন রাস্তা অতিক্রম করি। ঢাকার পথচারীদের জন্যে হাঁটার যে ব্যবস্হা সরকার করেছে তার বেশিরভাগই অবৈধভাবে দখল করা। চারচোখ খোলা না রেখে হাঁটা অসম্ভব। এমনি এক ছুটির দিনে হাঁটতে হাঁটতে টিএসসির সামনে যে গোল চত্বরটা, সেখানে ছোট বাউন্ডারি মতো দেয়ালের ওপর বসলাম। বসতেই এক বাদামওয়ালা এসে সামনে হাজির। তার থেকে দশ টাকার বাদাম নিয়ে বাদাম খাওয়ার ফাঁকে আশপাশটা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। অনেকটা পথ তথা লালবাগ থেকে হেঁটে আসার দরুন বেশ ক্লান্ত লাগছে। পাশেই এক মধ্যবয়স্ক লোক ডাব বিক্রি করছেন। এক লোক সপরিবারে হয়তো ঘুরতে বেড়িয়েছেন। তিনজন ছেলেমেয়ে সাথে।সবাইকে একটি করে ডাব কিনে দিলেন। ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দে তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে। পোশাক দেখে আন্দাজ করা যায়, বেশ উচ্চবিত্তই হবে। বাচ্চাগুলোর ডাব খাওয়া দেখে কোত্থেকে যেন এক ভিখিরি মতো লোক উপস্থিত। লোকটার নিকট আরজ করলো, ডাব খাওয়া হয়ে গেলে তাকে যেন শাশটুকু (ডাবের ভিতরের দানাযুক্ত নরম অংশ) দেন। লোকটা তার করুণ আবদার ভ্রূক্ষেপহীন তাচ্ছিল্যের সাথে এড়িয়ে গেল। পাশে আরেকটা লোক ডাব খাচ্ছিলেন। পোশাকে আভিজাত্যের কোন আভাস না থাকলেও দেখে ভদ্র ও শিক্ষিতই মনে হলো। তিনি ভিখিরিমতো লোকটিকে শাশওয়ালা একটি ডাব দিতে বললেন বিক্রেতাকে। ডাব পাওয়ার পর ভিখিরির মুখে যে অকৃত্রিম তৃপ্তিময় হাসি এবং ভালোবাসার কান্নার সংমিশ্রণ আমি দেখলাম; তাতে মনে হলো লোকটি তাকে একটিমাত্র ডাব দেয়নি সাত রাজার ধন দিয়েছেন। আমি পাশে বসে বসে এই দৃশ্য দেখে উপলব্ধি করলাম, মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পৃথিবী জয় করা লাগেনা। লাগে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। এই অসহায় মানুষগুলো চায় বিত্তবানদের একটু সহানুভূতিশীল হাতের পরশ। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে সহানুভূতিশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন।।

লেখক শিক্ষার্থী
১৬-১১-২০২০ খ্রি. কুমিল্লা

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

খেলনা

জান্নাতুল মাওয়া সুরভি

মা প্লীজ মা আমাকে এই খেলনাটা কিনে দেও না। আমি তোমার কাছে আর কখনো কোন খেলনা চাইব না,মা। আমি অসহায় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ব্যাগের চেইন খুলে একবার ভিতরে দেখে নিলাম। যদিও জানি দেখে কোন লাভ নেই। আমার কাছে সবসময় টাকা হিসেব করাই থাকে। ছেলেটা আমার এমনিতেই খুব লক্ষী। বাবা এই জিনিস এখন মা কিনে দিতে পারবো না; বলার পরে ঐ খেলনাটার দিকে কিছুক্ষন চেয়ে থাকবে তারপরে আর কখনো ঐ খেলনাটার কথা বলবে না। কিন্তু আজ যে কি হল! এই বাইনোকুলারটা দেখার পর আর আমি ওকে এই দোকানের সামনে থেকে সরাতে পারছিনা। ১০০ টাকা দিয়ে এই খেলনা আমি এখন কেন ; আগামী মাসেও ওকে কিনে দিতে পারবো না আমি জানি। আমাদের যে বড় হিসেবি সংসার। আমার ছেলেটাকে কখনই ভাল কোন খেলনা আমি কিনে দিতে পারিনি। ওর বাবা মাঝে মাঝে গুলিস্তান থেকে ২৫-৩০ টাকার কিছু সস্তা খেলনা নিয়ে আসে তাতেই ও খুব খুশি হয়। তাও আমি মানুষটাকে বকাবকি করি। কারন আমিতো জানি দুপুরে খাবার না খেয়ে সেই টাকা দিয়ে এই খেলনা কিনে আনে। ওর বাবা আমাকে বলে থাক না আমি একদিন না খেলে আমার শরী-রটা একটু শুকাবে, কিন্তু টুকুনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো ও কতো খুশি হয়েছে। আসলে ওর শরীর এমনেতেই শুকনো , মাঝে মাঝেই ও না খেয়ে এটা সেটা কিনে, খুবই সস্তা জিনিস,আমি রাগ করলেই ও এই কথা বলে।

আমি টুকুনকে এবার রাগ করলাম চল বাবা তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। তোমাকে এই খেলনা পরে বাবা আসলে কিনে দিবে। ওকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে হাঁটা দিলাম। কিছুক্ষন হাঁটার পরে বুঝতে পারলাম ছেলেটা কাঁদছে। কিন্তু আমি ওকে কিছু বললাম না। বাসায় এসে ছেলেকে পাশে নিয়ে বসলাম - বাবা তুমি তো কখনো কোন জিনিস কিনার জন্য এমন করো না আজ এমন করলে কেন সোনা ?

- আমার তো ঐ বাইনোকুলারটা খুব পছন্দ হয়েছে মা। আমার তো ঐ রকম একটা ও খেলনা নেই। জানো মা আমাদের ক্লাসের সবার বাসায় কি নাইস নাইস খেলনা আছে। রোবট আছে রিমোট কন্ট্রোল কার আছে , পাজাল আছে আরও কতো কি, মা ওরা আমাকে বলে। মাঝে মাঝে ইশান, আবির ওরা স্কুলেও নিয়ে আসে। মা কিন্তু আমাকে কখনো ধরতে দেয় না। কি বলে জানো মা; বলে কিনা আমি আগে কখনো চালাইনি তাই নাকি ওদের খেলনা আমি নষ্ট করে ফেলব। বাবা আমার জন্য যে খেলনা আনে ওগুলো তো বাবুদের খেলনা মা বলেই ছেলে আমার কাঁদতে লাগলো।

আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে চোখের পানি আটকালাম। ছেলের সামনে কাঁদা যাবে না, তাহলে ওর মন ছোট হয়ে যাবে। আমি টুকুনকে কেছে টেনে বসালাম। বললাম বাবা তোমার বয়স এখন ৮ বছর। মা তোমাকে আজ অনেক গুলো কথা বলবো এই কথাগুলো তুমি সারা জীবন যদি মনে রাখো তাহলে আর কখনো কষ্ট পাবে না। ও চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল হুম বল। আমি মনে রাখব তোমার কথা।

বাবা শুন তোমার বাবা খুবই কম বেতনের একটি চাকরি করে। সেই টাকা থেকে তোমার দাদু-দাদি কে গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়, আমাদের বাসা ভাড়া দিতে হয়,বাজার করতে হয়, তোমার স্কুলের টিউশন ফি দিতে হয়, এই খরচগুলো করতে করতে তোমার বাবার কাছে আর টাকা থাকে না সোনা। এই যে তুমি মাকে বল মা তুমি প্রতিদিন এই বোরকা আর এই ওড়না পরে যাও কেন? কি করবো বাবা মার যে এই একটাই ভাল ওড়না আছে। আর একটি হিজাবের তো কম করে হলেও দুই থেকে তিনশ

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

টাকা দাম। এই টাকাটাও আমাদের জন্য অনেক টাকা। এই যে মা তোমাকে কোন খেলনা কিনে দেই না সেই টাকা দিয়ে মা তোমার জন্য টিফিন দেই। তুমি কি জানো তোমার বাবা দুপুরের খাবার না খেয়ে সেই টাকা দিয়ে তোমাকে খুশি করার জন্য খেলনা কিনে আনে ? এখন তুমি যদি বল বাবার খেলনা তোমার পছন্দ হয়নি তাহলে বাবা কষ্ট পাবে না? তুমি জানো তোমার বাবা - মার কতো জিনিস পছন্দ হয় কিন্তু আমরা ওগুলো কিনি না। কারন ঐ টাকাটা আমরা আমাদের টুকুন সোনার স্কুলে দিতে হয়।
কেন জানো বাবা কারন আমরা তো টুকুন সোনাকে ভাল ভাল খেলনা কিনে দিতে পারিনা, ভাল ভাল খাবার খাওয়াতে পারিনা , তাই আমরা চাই আমাদের বাবু যেন ভাল করে লিখা পড়া করে অনেক বড় হয়। আর নিজের জন্য সব ভাল ভাল জিনিস কিনতে পারে। বাবা আমি জানি মার এই কথা বুঝার মত বয়স তোমার হয়নি কিন্তু কি করবো বল বাবা ,তোমাকে এই কথাগুলো বুঝতে হবে। এখন থেকে তুমি যদি মার পাশে না থাক তাহলে যে মা শক্ত হতে পারবোনা। তুমিইতো মায়ের শক্তি।
আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। টুকুন আমাকে শক্ত করে ধরে বলতে লাগলো মা আমি আর কখনো এমন অন্যায় আবদার করবোনা। আমি খুব মন দিয়ে পড়ব মা। বড় হয়ে তোমাকে আর বাবাকে তোমাদের পছন্দের সব জিনিস কিনে দিবো তুমি আর কেঁদো না মা।
আমার ছেলে তার কথা রেখেছে ও খুব মন দিয়ে লিখাপড়া করেছে। বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। সেই দিনের ঐ কথাগুলো কিভাবে যে আল্লাহ ওকে বুঝার তৌফিক দিয়েছেন আমি জানিনা। কিন্তু তারপর থেকে এই এত বছরে যে জিনিস না হলেই না সেই জিনিস ছাড়া আমার ছেলে আমাদের কাছে কিছুই চায়নি। আজকে আমার টুকুন আমাকে আর ওর বাবাকে নিয়ে বসুন্ধরাতে এসেছে। ছেলে আমার আজ প্রথম বেতনের টাকা দিয়ে বাবা-মাকে কিনা- কাটা করে দিবে। আমাদের বলল তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও আমি তোমাদের জন্য আইসক্রিম নিয়ে আসি। আমি ডান দিকে ফিরতেই দেখি কতো বড় এক খেলনার দোকান কি সুন্দর সুন্দর খেলনা ভিতরে। আমি টুকুন কে কখনো ভাল কোন খেলনা কিনে দিতে পারি নাই। তাই সবসময় খেলনার দোকান দেখলেই আমার বুকের ভিতরে এক ধরনের রক্তক্ষরন হয়। ছেলে মেয়ে কিছু চেয়েছে আর সেই জিনিস দিবার সাধ্য নাই। এটা যে কতো কষ্ট এই কষ্ট শুধু বাবা-মাই বুঝে।
মা , আমি তাড়াতাড়ি আমার চোখের পানি মুছে ফেললাম। টুকুন বলল এই দোকানে যাবে মা ?
- না বাবা এখন আর এই খেলনার দোকানে গিয়ে কি করবো?
- কেন মা আজ আমি খেলনা পছন্দ করবো আর তুমি আমাকে সেই খেলনা গুলো কিনে দিবে। বলেই ও কি সুন্দর করে হাসল। তারপর জোর করে আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে সত্যি সত্যি অনেক খেলনা কিনে ফেললো।
ও বলল- মা আমি জানি তুমি সব সময় খেলনার দোকানের সামনে গেলে আমার জন্য মনে মনে কতো খেলনা পছন্দ করতে। কিন্তু কিনতে পারতে না , লুকিয়ে কাঁদতে। আজ তাই আমি তোমার মনের আশা পূর্ণ করলাম ।তুমি আমার জন্য কতো খেলনা কিনে দিলে।
তুমি খুশি হয়েছো মা?
বাবা এখন এই খেলনাগুলো দিয়ে কি করবো?
কেন মা বাসায় যেতে যেতে দেখবে কতো বাচ্চারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তোমার টুকুন মনে করে একটি একটি খেলনা দিয়ে দিবে।
-আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম বাবা তুই যা চেয়েছিস কখনো তোকে তা দিতে পারিনি।
- মাগো যদি চাইলেই সব পেতাম তাহলে যে শুধু পাওয়ার আনন্দ পেতাম ।কিন্তু অন্যর না পাওয়ার কষ্ট বুঝতাম না। আমি আর ওর বাবা স্বপ্নেও ভাবিনি আমাদের গরিব ঘরে আল্লাহ টুকুনের মত এত বড় রত্ন দিবেন। আজ আবারও আমি ওকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

অদৃশ্য প্রেম

আলী হায়দার

নীরবে নিভৃতে ভাললাগা - লাগি
অস্পষ্টভাবে গন্তব্যহীন পথ চলা
শুধু মনে মনে সুখ দুঃখ অনুভব করি
অব্যক্ত কথাগুলো কবিতায় আসে
মনে মনে গুমরে মরি সদা
এভাবেই প্রেম চলে সংগোপনে
জনে জনে। কখনো এথায়, কখনো সেথায়
কখনো প্রাণে প্রাণে, কখনো প্রকৃতিতে দেখি
এ মনের খোরাক। কখনো একটি দুটি
হাসিতেই মজি, কখনো গুমরা মুখ দেখে
মনে মনে পঁচি। তবুও ব্যক্ত করা যায় না
মনের গভীরে থাকা প্রেম। মনের ভিতরে যদি
সদা থাকে তা গোপন, তবেই যেন তা
মধুর আস্বাদন। প্রেমে মুগ্ধ হই -
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ জনে জনে
প্রেমের ধরণ যেন বিচিত্র পবন।
তার পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা
সময়ের ব্যবধানে হয় ভিন্ন রকম।
এভাবেই চলে প্রেমের জোয়ার-ভাটা
বিভিন্ন সৈকতে বিভিন্ন রূপে
প্রেম আসে প্রেম যায় দিনে-রাতে-প্রভাতে।
আমার প্রেম দৃশ্যমান হয় নি কখনো
কোনো ঘাটে - কোনো অবয়বে!

জন্তু নিধন

আলী হায়দার

আমি কিছু হিংস্র জন্তু করব নিধন,
সেজন্য যাব সুন্দরবন,অ্যামাজান।
শালবন,গজারিবন,মধুপুর জঙ্গলে,
যাব যদি থাকে এরা গ্রহ মঙ্গলে।
আফ্রিকা, এন্টারটিকা,অস্ট্রেলিয়াও,
উত্তরমেরু,দক্ষিণমেরু, উর্ধ্ব,অধঃও।
কোথায় পালাবে এ সব হিংস্র জন্তু?
যাদের নেই কোনো জ্ঞান,আঁশ, তন্তু।
এ সব হিংস্র জন্তু সমাজের কীট,
এদের নিধনে সমাজ হবে নির্ঝঞ্ঝাট।
নানান প্রজাতির এরা ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত,
ভ্রান্ত মতবাদে লোকালয় করছে অশান্ত।
কোথায় নেই এদের বেপরোয়া হিংস্রতা?
ধ্বংস করছে এরা সততা, বিশ্বমানবতা।
শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, শিল্প, সমাজ,
মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মনুষ্যত্ব আজ।
নানান পোশাকে, নানান দেশে-ভাষায়,
মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে হায়!
হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যা ছড়ায়ে চারদিকে,
শান্তি, ঐক্য বিনাশ করে হাসে ফিকে।

নিকৃষ্ট পশু এরা, নিকৃষ্ট-হিংস্র জাত,
মানব-লোকালয়ে করছে উৎপাত।
এদের বিনাশ যদি না হয় এখন,
তবে মানব সুসভ্যতার হবে পতন।
তোমরাও এগিয়ে আসো হে ইনসান,
এসে এমন হিংস্র পশু কর নিধন।

দু'কলম বাংলাদেশ

নাজমুল ইসলাম সীমান্ত

[রাষ্টযন্ত্রের যান্ত্রিক ত্রুটিতে বলি হওয়া
শত শত বিদেহী প্রাণের মাগফিরাত
প্রার্থনায়]

সুবর্ণচরের মৎসখামারে
পড়ে আছে ধর্ষিতা বাংলাদেশ!

চকবাজারের চূড়িহাট্টায়, বনানীতে,
লালসা আর অপনীতির অনলে
লাশের মিছিল কাঁধে কাতরায়
এক বিদগ্ধ বাংলাদেশ।

আটপৌড়ে রিক্সাওয়ালার পিঠে
পুলিশের বসানো দগদগে ক্ষতে,
বসে আছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা!

নেশায় বুদ হয়ে থাকা
শত সহস্র তরুণ চেতনায়,
আদর্শচ্যুত পোশাকধারী কর্তালের
খিস্তি খেউড়ে,বিকৃত কর্তাপনায়...
চির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
নজরুলের বাংলাদেশ।

প্রহসনের বেদীতে দাড়িয়ে,
সাগর-রুনি-তনু-রাজনদের সাথে
চির উন্মাদিনীর মতো,
বিলাপ করে চলেছে
তারামনবিবি নামের এক
অভাগী বাংলাদেশ।

সড়কে সড়কে শিক্ষার্থীদের রক্তে
ছোপানো পতাকা হাতে দাড়িয়ে আছে;
শহীদ জননীর কোল শূন্য করে
আসা,আমাদের স্বাধীনতা।
শত রাতজাগা স্বপ্নে লালিত
আমাদের প্রিয় স্বদেশ,
আমাদের বাংলাদেশ।।
(২.৪.১৯ইং; ঢাকা)

জীবন বৃত্ত

ইমন হাসান শোভন

জীবনটা অনেক ছোট,
তবুও মানুষ হতে চায় আকাশের মতো বড়।
জানাটা ভুল নয়,মানাটাও ভুল নয়,
ভুল শুধু না জানা,না মানা।
যে বই পড়তে মানা সেটা খুলে পড়ে রিয়ালাইজ করাটাই
বিজ্ঞতা।
তুমি, আমি,সে কিসের এতো বড়াই? কিসের এতো অহমিকা?
কই কেউতো ধাক্কা দিয়ে পাহাড় সড়াতে পারে না! তাইতো
শুনো তোমাকেই বলছিঃ
হও যদি বিনয়ী,হও যদি উদার।
তবেই পাবে ভালোবাসা সবার।

আমার খুব ইচ্ছে জাগে

নৌশিন সাঈদা

আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
শরতের শোভা দেখতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
মেঘের রং আঁকতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
দূরের পাহাড়ে মিশতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
বৃষ্টি বিলাসে নাচতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
বন্দিহীন হয়ে বাঁচতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
পুরুষহীন শহরে হাঁটতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
একটিবার পুরুষ হয়ে জন্মে দেখতে।
আমার খুব ইচ্ছে জাগে,
খোলা জানালা ছেড়ে উড়তে।

মর্মে বাজুক

মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

ধর্ম সবার মর্মে বাজুক
ভুলেও করোনা কটুক্তি
ধর্মের রঙে সবাই সাজুক
করুক একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

করো তুমি নিজ ধর্ম পালন
পর ধর্মের প্রতি করো না বিদ্বেষ
অন্তরে করো সহবত লালন
এটাই আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) নির্দেশ।

ঐ শোনো মসজিদে আযান
মন্দিরে বাজিছে ধ্বনি ঘন্টার
নামাজ মুসলিমের প্রাণ
ঘন্টার সাথে যোগ যে পুজার!

গির্জায় গির্জায় করে সবে প্রার্থনা
বৌদ্ধ -মন্দিরে জপে অহিংসার বাণী
খ্রিস্টান গডের সাথে যিশুর বন্দনা
জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক বলে বৌদ্ধ ধ্যানী

যে যার ধর্মমতে করো মহৎ কাজ
করো না গীবত ও কুৎসা রটনা
বিচারক আছেন একক সত্তা রাজাধিরাজ
মিজানের পাল্লায় মেপে পাবে মার্জনা!

তুলো না পরধর্মের প্রতি আঙুল
সব ধর্মের মিলনে উঠুক ঐক্যতান
ধর্ম হলো বিশ্বাসের একমাত্র মূল
বিভেদ ভুলে হোক সকল ধর্মের সহাবস্থান।

স্বাধীনতা মানে

সাহিদা আখতার

স্বাধীনতা মানেড়
নিজের দেশের মাটিরওপরে
স্বাধীনভাবে বাঁচা,
নিজের মতো করে।
স্বাধীনতা মানেড়
হৃদমাঝারে লুকানো কথা
বলতে পারা,বলিষ্ঠ স্বরে।
স্বাধীনতা মানেড়
জীবনে যা করতে চাই,
তা নিরদ্বিধায় করে ফেলা;
কাউকে ভয় না করে।
স্বাধীনতা মানেড়
অন্তর মাঝে অব্যক্ত এক সুখধারা,
সকল দুঃখকে জয় করে।
আমার স্বাধীনতা মানেড়
যা লিখতে চাই,কবির কলমে
অবলীলায় তা লিখতে পারা;
নিজের মতো করে।

বাংলাদেশ

খন্দকার আমিনুজ্জামান

রুপ অপরূপ সবুজ স্যমল সোনার বাংলাদেশ
কত ভালবাসি তবুও ভালবাসার হয়না কভু শেষ

হাওড় বাওড় পাহাড় টিলা কি সুন্দর সমতল
নদি নালা খাল বিল জলে করে ছল ছল
এমন দেশ বাংলাদেশ ভালো লাগার নাইকো শেষ

বারো মাস ফুল ফল ফসলের জয়গান
দোয়েল কোয়েল ঘুঘু শ্যামা কোকিলের কহুতান
এমন দেশ বাংলাদেশ এই মাটিতেই জীবন হোক শেষ

হিন্দু মুসলিম বদ্ধ খিস্টান
এক সাথে গড়বো দেশের মান
এই চেতনা অমর হোক, এটাই সর্বশেষ

দেশের মাটি

খন্দকার আমিনুজ্জামান

আমার দেশের মাটিরে ভাই সবার চেয়ে খাঁটি
চল না খালি একটুখানি পেয়ে দপ দপায়া হাটি

মনে হয় শরীরে রসের জোগান নিলাম
মাটির সোঁদা গন্ধে মন টা ভরে দিলাম
আহা প্রানের চেয়ে প্রিয় আমার দেশের মাটি

এই মাটিতে বারো মাস ফুল ফল ফসল ফলে
তাই দিয়ে চোখ জুড়ায় মন ভরে পেট চলে
ওরেও মৃত্যুর পর আমি পাই যেন এই মাটি
এই মাটির তরে যুদ্ধ করে রক্ত দিলো কত বীর জনতা
এখানে আনবো মোরা তাদের স্বপ্নের সাম্য একতা
তবেই মোরা হব এই মাটির মতই খাঁটি

সময়

আবদুল আজিজ ফয়সল

চলে যাওয়া সময়গুলো বড় ই অভিমানী!
কখনওই ফিরে আসেনা!
ফিরে আসে, বারে বারে বর্তমান,
অতিত চলে যায় ফিকেদের শহরে।
রেখে যায় হাজার স্মৃতি!
চাইলেও আর ফেরা হবে না...
কেবল নিষ্ঠুর গ্লানি গুলো কড়া নাড়ে,
ভবিষ্যতের দ্বারে,
সময়কে, কও বিদায় দিতে চায়না।
সে বিদায় নিয়ে যায়, না ফেরার দেশে।
সময় দিব্বিই ভালো থাকে,
ঘটে যাওয়া গল্পগুলো নিয়ে।
বর্তমান, কি পায় নি?
সেই হিসেব কসে!
মাঝে মাঝে ধুলো গুলোয় ফু দিয়ে
স্মৃতির পাতায় হাটে।
চোখগুলো ছল ছল করে,
যদি পারতাম, আবার ছোট্ট বেলায়
যেতে!
সময় গুলো বড়ই অভিমানী!
জীবন কেটে যায় গল্প বুনার তালে।
নতুন অধ্যায়, নতুন সময় আসে বারে
বারে,
ভালো কাটুক প্রতিটি বর্তমান,
ভবিষ্যতের কালে।
ভালো থাকুক সবাই জীবন গল্প নিয়ে।

শুকরিয়া

আনিস সাকিব

ইয়া রহিম
তুমি ছাড়া নাই
খেয়ে-পড়ে তোমার
গুন-গান গাই
অসহায়রে দিয়েছো
রাজার সন্মান
তুমি দাতা
তুমিই রহমান।
তুমি সঙ্গী
হাজার দুঃখী রাতের,
ফুটিয়েছো হাসি
কত মলিন প্রভাতের।

(শিশুতোষ গল্প)

ফেরা

আনিস সাকিব

অবনির মন সব সময় খারাপ থাকে। সে ফুলকলি কিন্ডারগার্ডেনে ক্লাস টু তে পড়ে। আর সবার মত অবনির ও ইচ্ছে হয় বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতে। সবাই বাবার হাত ধরে স্কুলে আসে আর অবনিকে যেতে হয় ড্রাইভারের সাথে। কিন্তু যাবে কিভাবে, অবনির বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন।

অবনিদের অংকের নতুন টিচার আসবে আজ। এই টিচার আগের জনের মত রাগী না। চশমা পরে চিকন একজন ডুকেই বললেঃআমি তোমাদের নতুন টিচার।

সবাই এক সাথে দাড়িয়ে সালাম দিলো। ওয়ালাইকুমুস সালাম বলে স্যার বললেন অংক করতে হয় আনন্দ নিয়ে,উৎফুল্ল মনে। তোমাদের কারো কি মন খারাপ? বলো আমি খুশি করে দেই। অবনির বান্ধবী মিনু বলে উটলো স্যার অবনির বাবা তো নেই তাই ও মন খারাপ করে থেকে।

স্যার অবনিকে বললেন কি হয়েছে তোমার বাবার? মুখ নিচু করে সে বললো এক্সিদেন্টে আমার বাবা মারা গেছেন

স্যার অবনির মাথায় হাত রেখে বল লেন শুন মেয়ে মন খারাপ করবে না। তোমার বাবা কে তিনি নিয়ে গেছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তোমার বাবা অনেক যত্নে আদরে আছেন। তুমি মন খারাপ করবে না। বরং আল্লাহ্‌র কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করবে যেন তিনি ভালো থেকন।

অবনির এখন মন খারাপ হয় না। সে মায়ের সাথে নামাজ পড়ে বাবার জন্য দোয়া করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ

সুন্দর আলী

আবুল হাশেম

সময়টা বোধ করি হাজার ১৯৯০ খ্রি. ভরা আষাঢ়, ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছি কুমিল্লা। তখনও দাউদকান্দির মেঘনা-গোমতী সেতুর কাজ শুরু হয়নি। ফেরিতে গাড়ি পারাপার হতো। আমাদের গাড়িতে উঠার পরই আমি গাড়ি থেকে নেমে ফেরির ছাদে উঠছি, উদ্দেশ্য নদীর দৃশ্য দেখা।
সেদিন সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি ঝরছে৬এমন বাদলের দিনে বাহিরে কে যায়রে ৱে। রবি ঠাকুরের এই উপদেশ উপেক্ষা করে যাওয়া। প্রায় কাকভেজা হয়ে গাড়িতে উঠেছি। সম্পূর্ণ গাড়ি খালি আমরা ১৫/২০ জন মাত্র যাত্রি। দাউদকান্দি যখন পৌছালাম, তখন বিকেল সাড়ে ছয় কি সাত টা ছুঁই ছুঁই করছে। বৃষ্টি থেমে গেছে মেঘের ফাঁকে হেসে উঠেছে পড়ন্ত বেলার সূর্য। যেনবা আঁখি মেলে শেষবার পৃথিবীর রূপ দেখছে দিবাকর।
নদীর বুকে দাড়িয়ে এমন দৃশ্য কার না মন ছুঁয়ে যায়? কাজেই আমার পক্ষে গাড়িতে বসে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব..
ফেরিতে মানুষের কোলাহল তেমন নেই। বৃষ্টির জন্য ফেরি-ওয়ালাদের বিরক্তিকর চিৎকারও নেই। আমি রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দূরে নদীর বুকে দৃষ্টি ফেলি। বিকেলের অস্তগামী সূর্যলোক স্বর্ণ কনা যেন ছড়িয়ে দিয়েছে মেঘনার ঢেউয়ের বুকে। আমার আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছিল, আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের পর...
ফেরির এক কোণে বসে আছে একটি লোক, বড় বড় চুল ও দাড়ি তে জট পাকানো। ময়লা ছেড়া পোশাকে গা আবৃত, কাপড়ের একটি পুটলি, মায়ের কোলে দুধের শিশুর মতো যত্নে বুকের সাথে লেপ্টে ধরা। আমার হঠাৎ বৃষ্টি পরে এই অদ্ভুত লোকটির উপর। তার উজ্জ্বল দুটো চোখ আমার দিকে দৃষ্টি ফেলে।
এক সময় আমি নিজেই চমকে উঠি।
সতর্ক দৃষ্টি ফেলতেই বুঝলাম, এ আর কেউ নয়.....
আমাদের সুন্দর আলী!
ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের সাহসী লোক বলে জানতাম এই সুন্দর আলীকে। একসময় আমাদের গ্রামে চুরি বেড়ে গিয়েছিল, সেই সময় উপর্যুপরি ছুরির অনেক আঘাত সহ্য করেও চোর ধরে সুন্দর আলী গ্রামের হিরো হয়ে উঠেছিল।
আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করছে, অন্য একটি দৃশ্য। এক শীতের সকালে ঘুম ভেঙ্গে কুয়াশার কাফন ভেঙে পাড়ার অনেক ছেলে মেয়েদের সাথে নদীর দিকে দৌড়াচ্ছি। আমাদের ছোট ক্ষীর নদীটির ঘাটে এসে ভিড়েছে রঙিন কাগজে সাজানো বিশাল এক নৌকা। এই ঘাটে অতীতে এত বড় নৌকা দেখিনি। সুতরাং আশেপাশে অনেক গ্রাম থেকেও ছেলে মেয়েরা ভিড় করছে। সুন্দর আলী নৌকা থেকে নেমে পুটলি থেকে মুঠি মুঠি বাতাসা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই দিন কি বিশাল মনে হয়েছিল সুন্দর আলীকে ও তার নৌকাটিকে।
এরই মধ্যে আমাদের ছোট ক্ষীর নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। সুন্দর আলী বেপারী বাড়িতে রঙিন টিনের ঘর উঠেছে। সামনে অপূর্ব সুন্দর ফুলের বাগান। ১৯৬৪তে বি ডি মেম্বারের ইলেকশন করে- মিস ফাতেমা, স্লোগান দিয়ে সুন্দর আলী ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছে। কতদিন দেখতে পেয়েছি সুন্দর আলীর রঙিন টিনের ঘরে গ্রামের লোকে লোকারণ্য। জমজমাট আড্ডা চলছে, চলছে হুক্কা খাওয়ার ধুম, কখনো বাজছে উচ্চস্বরে রেডিও-
এর মধ্যে সুন্দর আলীর ঘর আলো করে এসেছে দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। বাড়ির সামনে খেলা রত প্রাণোচ্ছল তিনটি শিশু পথিকের মন প্রাণ কেড়ে নিতো।
১৯৭১ খ্রিঃ বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। পাকবাহিনী এদেশীয় দালাল রাজাকার-আলবদর-আলশামস চালাচ্ছে নারকীয় তাণ্ডবড়- জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম, হাট, গঞ্জ, শহর, জনপদ। নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মায়ের কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশু ও রেহাই পাচ্ছে না।
জ্যৈষ্ঠের এক সকালে হানাদার বাহিনী হামলা করে আমাদের গ্রামে। হিন্দু পাড়ায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আগুন, জ্বলে উঠে মতিন সরকারের বাড়ি, কেননা ওই বাড়ি ছিল আওয়ামী লীগের ঘাঁটি। আক্রান্ত হয় সুন্দর আলী মেম্বার বাড়ি। কেননা, সে ভোট দিয়েছিল ফাতেমা জি-ন্নাহকে একশত টাকা ও রেডিও মন ভোলাতে পারেনি তাকে।
বাড়ির উত্তর পাশে ঘন ঝোপে আশ্রয় নিয়েছিল সুন্দর

আলী। সেখান থেকে দেখেছে, উঠোনে তারপাতি বউ ও সন্তানদের নির্মমভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতে, অতঃপর দাও দাও করে তার সাজানো বাড়ি পুড়ে ছাই হতে।
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন সুন্দর আলী। ঘর-সংসার হারিয়ে আশ্রয় নেয় মসজিদে, সারাদিন নামাজ পড়ে, জিকির করে, কোরান পড়ে, কেউ কিছু দিলে খায়, না দিলে উপোস করে।গ্রামের জামে মসজিদের মিম্বর ধরে মাঝরাতেও সুন্দর আলী কেঁদে বুক ভাসাত।
কতদিন মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে মাঝরাতে শুনেছি, ইয়া-সিন অয়াল কুরআনুল হাকিম, ইন্নাকা লা মিনাল মুরসালিন, আশা ছিরতিম মুস্তাকিম...। কিংবা সুন্দর আলী কেঁদে কেঁদে মোনাজাত করছে, রাব্বানা আ-তি-না ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আজাবান্নার....।
একদিন ফজরের নামাজ শেষে আমার হাত ধরে বললো, বাবা আমি গতরাতে তোমার চাচীদের দেখলাম, বাচ্চাদের নিয়ে বেহেশতের দুয়ারে খাড়য়ে আছে, বলেই - হু হু করে কেঁদে ওঠে শিশুর মত।
অন্য একদিন ভোররাতে আমার বৈঠক ঘরে (বাড়িতে গেলে এ ঘরে থাকতাম) এসে আমার ঘুম ভাঙালো, কতা কওনের মানুষ পাই না, তাই তোমার ঘুম ভাঙ্গাইলাম-
সেদিন সুন্দর আলী যা বলে ছিল তা রীতিমতো আমাকে চমকে দিলো, বাবা তোমার কাছে একটা কথা কই মনে রাইখো - ধর্ম, ভগবান, বেহেশত-দোজখ এইসব কিচ্ছু নাই নাই... বলতে বলতে বেরিয়ে যায়..
কোন এক সময় সুন্দর আলীর বাড়ি ঘর ভাই ও ভাইয়ের ছেলেদের দখলে চলে যায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে সে।
তারপর কত বৎসর গেছে মনে নাই। জীবনের প্রয়োজনে একসময় গ্রাম ছেড়ে চলে আসি শহরে। বাড়ির সাথে সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। একবার বাড়িতে গিয়ে জানলাম সুন্দর আলী মসজিদ ছেড়ে এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। সে বদ্ধ পাগল, বাচ্চা ছেলে মেয়েরা রাস্তায় ঢিল ছুঁড়ে কখনো সখনো। অন্য একবার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম সে গ্রাম ছেড়ে দিয়েছে, কেউ তার খবর জানেনা।
এত বছর পর তাই আমি সুন্দর আলীকে দেখে চমকে উঠি। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াই,
-মেম্বার কাকু, সুন্দর আলী আমার ডাকে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে সন্দেহ ভরা দৃষ্টি ফেলে আমার উপর। ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। একসময় দৃষ্টি ফেরায় দূর দিগন্তে, দেহেন! দেহেন! কত পইখ.. ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠে সুন্দর আলীর।
আমি সামনের দিকে চোখ তুলি, যেখানে এক ঝাঁক বালিহাস দিগন্ত রেখায় হারিয়ে যাচ্ছে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে...।

লেখক অবসর সিনিয়র শিক্ষক
বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ